সানন্দা

৩০ জুলাই ২০২২

সানন্দা প্রচ্ছদকাহিনি

নিজের ভাল থাকাই আসলে ব্যক্তিত্বের উদযাপন। মেয়েদের ডায়েট, ফিটনেস, ইমপারফেকশন, শরীর ও মনের স্বাস্থ্য...সব কিছু নিয়ে জন্মদিনে পাঠকদের সানন্দার উপহার।

আমিত্বের উদ্‌যাপন

রান্নাঘর

সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব রেসিপিতে বাংলা ও বিশ্বের মেলবন্ধন

দুই বাংলার ইলিশ

পার্শ্বরচনা

আয়ুর্বেদ চর্চায় ভাল থাকা

ফ্যাশন

সেলফ লাভ

মুখোমুখি

জিতেন্দ্র কুমার

শ্বেতা ত্রিপাঠী শর্মা

বার্থডে স্পেশ্যাল

জন্মদিনে সানন্দার সঙ্গে সম্পর্ক শেয়ার করলেন অভিনেত্রী ইশা সাহা

সূচিপত্র

৩৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা। ৩০ জুলাই ২০২২। ১৩ শ্রাবণ ১৪২৯



৪

প্রচ্ছদকাহিনি ১

Be Yourself

মহিলা মানেই তিনি দশভুজা। আত্মত্যাগই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই সমাজ নারীকে 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। তাই নিজেকেই সেই সাহস জুগিয়ে চলতে হবে নারীদের। একটি আলোচনা।



৮৪

রান্নাঘর

দুই বাংলার হেঁশেল থেকে...

ইলিশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুই বাংলার আবেগ। রন্ধনপ্রণালীতে এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলার ফারাক থাকলেও, স্বাদে কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়তে নারাজ। 'সানন্দা'র জন্মদিন উপলক্ষে লোভনী ইলিশের পদ।

প্রচ্ছদ: ইশা সাহা
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
পোশাক: কোমল সুদ, পার্ক স্ট্রিট
ফোন: ৯১৬৩৪৬৯৯৮৬
গয়না: নিভি
ফোন: ৯৮৩০৭৭২৫২৫
লোকেশন: অল্টেয়ার বুটিক হোটেল
ফোন: ০৩৩৭১০১৭১০১
ছবি: সোমনাথ রায়

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত
এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

30th July 2022, 36 years 24 Issue.



পায়ে পায়ে ভারতবর্ষ

সানন্দা-র ১৫ জুলাই ট্র্যাভেল সংখ্যাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। প্রতি বছর এই ট্র্যাভেল স্পেশ্যাল সংখ্যার অপেক্ষায় আমি বসে থাকি। কত দেশ, বিদেশের অজানা তথ্য আমরা জানতে পারি। এইসব দেখে সেখানে যাওয়ার প্ল্যানও করতে পারি। ট্র্যাভেল নিয়ে এই তথ্যবহুল সংখ্যার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা রাখি, আগামী দিনেও সানন্দার পাতায়-পাতায় এই রকম আরও নানা বেড়ানোর জায়গার সুলুকসন্ধান আমরা জানতে পারব।

সুস্মিতা সাহা, গড়িয়া
ইমেল মারফত

কেরলের স্বাদ বাড়িতে

১৫ জুলাই 'সানন্দা' সংখ্যার 'রান্নাঘর' বিভাগে রেসিপিগুলো আসাধারণ লাগল। কেরল আমার খুব পছন্দের জায়গা। কেরলের খাবারও আমার খুব ভাল লাগে। 'সানন্দা'-র পাতায় কেরলের খাবারের রেসিপি দেখলে তাই নিজেকে আর সামলাতে পারি না। ইতিমধ্যেই কয়েকটা রেসিপি বাড়িতে ট্রাই করেছি। 'এরাচি ইশটু' রেসিপিটি খেতেও দারুণ হয়েছে। ভবিষ্যতে এইরকম আরও অভিনব রেসিপির সন্ধান আপনাদের কাছে থেকে আশা করব।

পম্পা রায়, বর্ধমান
ইমেল মারফত

রামপুরি দাওয়াত

'সানন্দা' ১৫ জুলাই সংখ্যায় 'রামপুরি দাওয়াত'-এ যে রেসিপিগুলো দেওয়া হয়েছে, খুব ভাল লাগল। বেশ অন্যরকম স্টাইলের রেসিপিগুলো। কয়েকটি বাড়িতে ট্রাইও করলাম।

রিয়া রায়, নদিয়া
ইমেল মারফত

ঘুরে আসি প্রাণভরে

সানন্দা-র ১৫ জুলাই ট্র্যাভেল সংখ্যাটি হাতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে পেলাম নতুনত্ব। বিশেষ করে ট্র্যাভেল ফ্যাশনের লুকগুলো খুব ভাল লেগেছে। একদম অন্যরকম ভাবনাচিন্তা ও নতুন কিছু করার প্রয়াস ফুটে উঠেছে ছবিগুলোর মধ্যে। আগামী দিনে এরকম আরও ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, অভিনবত্ব আমরা সানন্দার থেকে আশা করব।

অন্বেষা দাস, নাকতলা
ইমেল মারফত

গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ

সানন্দা-য় গল্প এবং উপন্যাস মনোনয়নের জন্য পাঠাতে চাইলে হাতে লিখে কিংবা প্রিন্টআউট করে আমাদের দফতরে পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠানো গল্প সানন্দা-র প্রিন্ট সংস্করণের জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্যই নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যেন লেখা থাকে। গল্প বা উপন্যাস মনোনীত হলে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি চেয়ে নেব। গল্পের শব্দসংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০।

ঠিকানা:
সানন্দা গল্প বিভাগ,
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

যাঁরা সানন্দা-র ওয়েবসাইটের জন্য গল্প পাঠাবেন, তাঁরা ১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প মেল করবেন, হার্ড কপি পাঠাবেন না। মেল-এর সাবজেক্টে অবশ্যই লিখবেন 'সানন্দা ওয়েব গল্প'। ভ্রমণকাহিনির ক্ষেত্রে ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল করতে হবে। ছবি ভাল রেজ়লিউশনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে হাতে লিখে পাঠানো ভ্রমণকাহিনি গ্রাহ্য হবে না। প্রিন্টেড ছবি পাঠাবেন না। ডিজিটাল ছবি পাঠাতে হবে। অন্য বিভাগে লেখা পাঠাতে হলে মেল-এ সাবজেক্ট অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।

মেল আইডি:
sananda@abp.in

সু দো কু

১৪৬

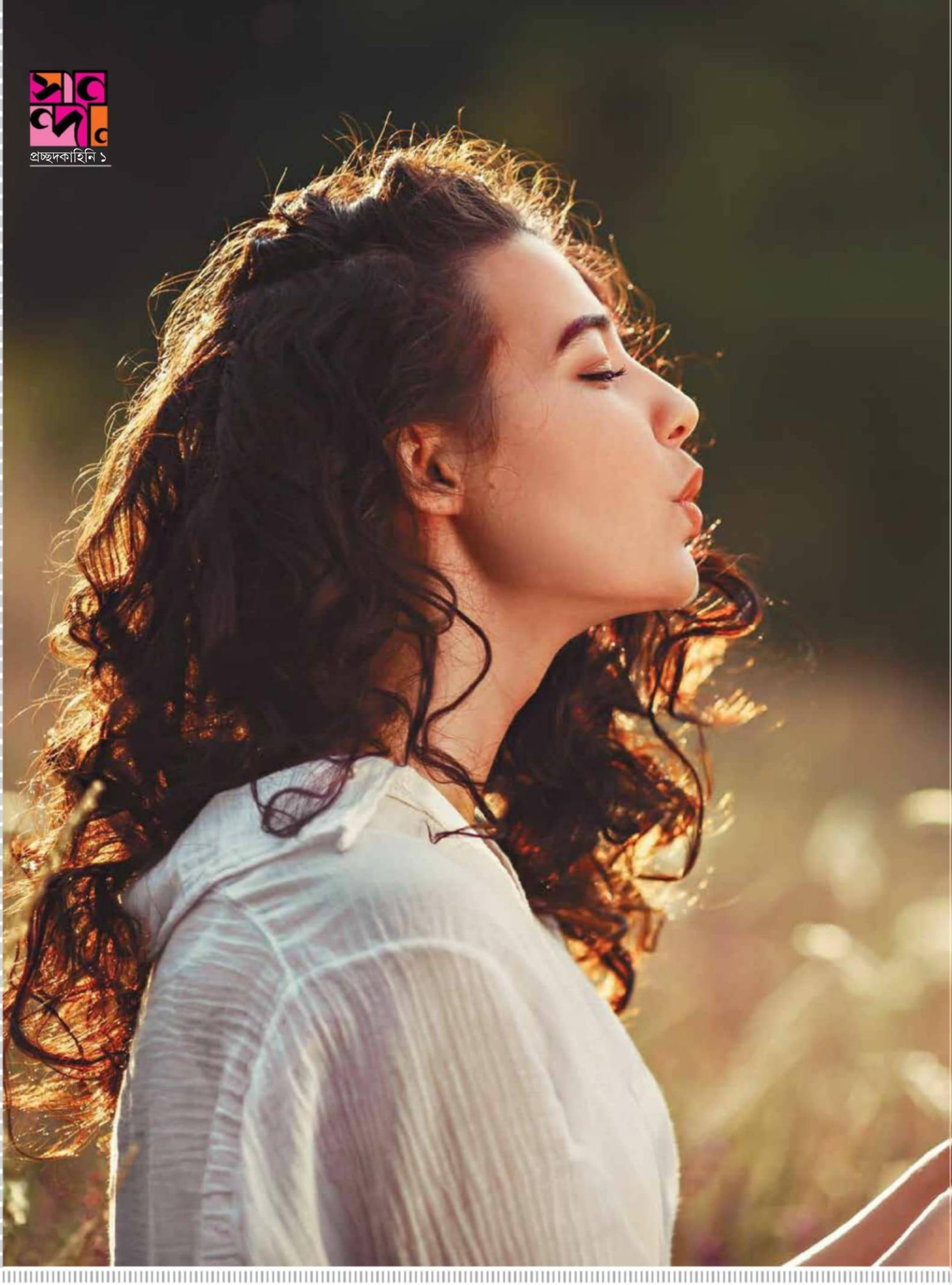
১		৮		৭		৫		৩
৩								
৪		৭			৫		১	
	১	৬			২	৪		
৭		৪		৬		২		১
		৯	৪			৬	৩	
	৭		৬			১		৫
								৮
৯		১		৪				২

উপরের ছকগুলিতে মোট ৯টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলিতে হিসেব করে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে উপরে-নীচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

৩০ জুন সংখ্যার সমাধান

২	৫	৮	৩	৪	১	৯	৭	৬
৭	৯	৩	৬	২	৮	৫	১	৪
৪	১	৬	৯	৭	৫	৮	২	৩
৮	৬	৯	৪	১	৩	২	৫	৭
৩	৪	১	৭	৫	২	৬	৮	৯
৫	৭	২	৮	৯	৬	৪	৩	১
৬	২	৪	৫	৩	৭	১	৯	৮
৯	৩	৫	১	৮	৪	৭	৬	২
১	৮	৭	২	৬	৯	৩	৪	৫



ব্যক্তিত্বের উদ্‌যাপন

Be Yourself

পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র ‘জেন্ডার রোল’-এর নিরিখে আপনার থেকে যা-ই প্রত্যাশা করুক না কেন, প্রত্যাশার চাপে নিজের আমিত্ব হারিয়ে ফেলবেন না। নিজের শর্তে জীবন বাঁচার সাহসটুকু জুগিয়ে ওঠা জরুরি। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।



মাল্টিটাস্কিং হতেই হবে?

মেয়েদের নাকি ‘দশভুজা’ হতে হয়! প্রায়ই আপনার আশপাশে কোনও কর্মঠ মহিলার উদাহরণ দিলেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ‘‘বাহ, দেখ অমুকে কেমন দশ হাতে সব সামলাচ্ছে!’’ ‘সব’-এর মানেটাও এক একজনের কাছে আপেক্ষিক। কেউ হয়তো চাকরি, সংসার, সন্তান, শ্বশুরবাড়ি কী সুনিপুণ দক্ষতায় ব্যালান্স করে যাচ্ছেন। কেউ বা আবার ব্যবসা ও সংসারের মধ্যে ব্যালান্স করছেন। কেউ আবার হয়তো চাকরিরতা নন, তিনি বাড়িটাকেই একা হাতে আগলে রাখছেন...মানে ‘রমণীর গুণে’ সংসারকে সুন্দর করতেই হবে এমনটাই লক্ষ্য। আচ্ছা, এই ব্যালান্স করতে পারাটা কি সবসময় খুব জরুরি? আমরা ধরেই নিই, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ঘরোয়া কাজে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ। তাঁরা অনেক বেশি গুছিয়ে কাজ করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ এমনটা না পারেন? যদি কেউ চাকরি-কেরিয়ারে মন ঢেলে দিতে গিয়ে সংসারে মন না দিতে পারেন? হতেই পারে, একদিন তিনি হয়তো তাঁর সন্তানের হোমওয়র্ক দেখতে পারলেন না বা একদিন বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারলেন না। তাহলেই কি ‘স্ট্যান্ডার্ড নর্ম অফ বিহেভিয়ার’-এ তিনি পাশ করতে পারবেন না? আমরা কেউই তো সব কাজ জানি না বা



পারি না। পারার প্রয়োজনও নেই বোধহয়। হয়তো আপনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন, বা ভাল ছবি আঁকতে পারেন। এর পাশাপাশি আপনি ভাল রান্না করতে পারলে তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু তা জানতেই হবে, তেমনটা তো নয়! 'দশভুজা' হওয়ার প্রত্যাশা একজন মেয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা আছে কি? আমাদের জীবনে বিভিন্ন দায়িত্বগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করে নিলে তার মধ্যে পেশাজীবন, ব্যক্তিজীবন, সংসারজীবন...এগুলো আসবে। এগুলোর মধ্যে ব্যালান্স করে চলতে পারলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যালান্স না করতে পারলেও নিরন্তর 'পারফেক্ট' হওয়ার প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন বোধহয় নেই। সময় বদলাচ্ছে ঠিকই। এখন অনেক পরিবারেই মহিলা ও পুরুষদের জন্য 'ফিক্সড ডোমেন অফ ডিউটি' নেই। ছেলেরাও হাউজ় হাজ়ব্যান্ড হচ্ছেন, তাঁরাও সংসারের দায়িত্ব নিচ্ছেন। শ্বশুরবাড়ির সাপোর্টও পাচ্ছেন অনেক মেয়েই। কিন্তু এসবের পরেও, তুলনামূলকভাবে মাল্টিটাস্কার হওয়ার, দশভুজা হওয়ার প্রত্যাশার চাপ একটু হলেও মেয়েদের বেশি। 'ভাল' স্ত্রী হওয়ার, 'ভাল' মা হওয়ার, 'ভাল' বউমা হওয়ার...এ তো গেল সাংসারিক প্রত্যাশা। এর বাইরেও কোড অফ কনডাক্ট নিয়ে মেয়েদের থেকে সমাজের প্রত্যাশা। প্রত্যাশার প্রথম ধাপটা শুরু হয় পরিবারের থেকে। ঠিক যেমন অনেক পরিবারে শেখানো হয় 'ছেলেদের কাঁদতে নেই', তেমনই মেয়েদের জন্যও আচার-ব্যবহারের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মগণ্ডি বেঁধে দেওয়া হয়। এরপরের ধাপে সমাজ ও রাষ্ট্র। চল্লিশেও অবিবাহিত? ডিভোর্সি? সিঙ্গল মাদার? সাধারণ পরিবারের মেয়ে হয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বোহেমিয়ন জীবনযাপন? এসব খুব সহজে কে-ই বা কবে মেনে নিয়েছে! রাষ্ট্রের বিভিন্ন যন্ত্রও কখনও মেয়েদের পোশাকের উপরে অবধি ফতোয়া জারি করেন। মোদ্দা কথা হল, কিছু নির্দিষ্ট প্রত্যাশার দায়ভার মেয়েরা না নিতে চাইলেই মুশকিল। তবে একথাও ঠিক, সব মেয়েরাও কি সবসময় স্বাধীনচেতা জীবন বাঁচতে চায়? নিজেদের মতো করে জীবন বাঁচার চেয়ে অন্যের প্রত্যাশাপূরণ করতেই তাঁরা আগ্রহী।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী...

এখন আমরা অবশ্যই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে 'ইনক্লুসিভ' হতে চেষ্টা করছি। দিকে দিকে প্লাস সাইজ় বিউটি প্যাজেন্ট। মেনস্ট্রিম ফ্যাশন-বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে জেন্ডার বাইনারি ভেঙে

> তুলনামূলক ভাবে মাল্টিটাস্কার হওয়ার, দশভুজা হওয়ার প্রত্যাশার চাপ একটু হলেও মেয়েদের বেশি। 'ভাল' স্ত্রী হওয়ার, 'ভাল' মা হওয়ার, 'ভাল' বউমা হওয়ার...





ফেলার প্রচেষ্টা। কিন্তু সমাজের গভীরে সকলেই কি সেই দর্শনে বিশ্বাস করেন? এখনও বিয়ের বাজারে 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' হওয়ার চাহিদা তুঙ্গে! খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে ভিড় করে থাকে সুশ্রী, ফরসা, গৃহকর্মে নিপুণা মেয়েদের ডিমান্ড। পুরুষদের জন্যও নিশ্চয়ই 'প্যারামিটার' আছে। সুচাকুরে, উচ্চ-উপার্জনকারী...কিন্তু রূপ বা ঘরের কাজের দক্ষতা বিচার্য হয় না সেরকম একটা। তবে এসবই সাধারণীকরণ করে করা মন্তব্য নয়। অনেক পরিবারেই 'রোল রিভার্সাল' হয়। সেখানে মহিলারা হয়তো তাঁর স্বামীর চেয়ে বেশি মাইনের চাকরি করেন। যেখানে, সন্তানের দায়িত্ব একা হাতে বাবা সামলান। তবে সেসব এখনও ব্যতিক্রমই বটে! লোকে কী বলল, কী ভাবল সেসব কথায় আমল না দিয়ে বরং নিজেকে সেলিব্রেট করুন। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। 'বডি শেমিং' আর 'স্লাট শেমিং', এই দুই-কেই জাস্ট গুরুত্ব না দিয়ে এগিয়ে চলুন। অন্য কারও অ্যাপ্রুভালের উপর ভিত্তি করে নয়, যাতে আপনি ভাল থাকেন, সেটাই করুন। আপনি কিসে 'ভাল' থাকেন, এই বোধটাও তৈরি হওয়া জরুরি। এক কমবয়সি মহিলাকে একবার বলতে শুনেছিলাম, 'সন্তানের সুখেই তার সুখ'। এতে দোষের কিছু নেই। কেউ উচ্চশিক্ষিত হলেই তাঁকে চাকরি করতে হবে, নিজে উপার্জন করতে হবে, তেমনটা আপনি না-ই চাইতে পারেন। কিন্তু আপনি যেটাই চান না কেন, তা যেন অন্য কারও দ্বারা ডিক্টেটেড না হয়। অর্থাৎ, পরিবার বা সমাজ আপনাকে ভাল মা ও ভাল স্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় বলে আপনি নিজস্বতা ভুলে যাবেন, তেমনটা যেন না হয়।

সিদ্ধান্ত নিন নিজে

আমাদের দেশে অনেক মহিলাই এখনও নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তিনি কখন বিয়ে করেন, কবে মা হবেন, আদৌ মা হবেন কিনা, কী ধরনের চাকরি করবেন, চাকরি বা পড়াশোনার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন কিনা, খেলাধুলো করবেন কিনা...এসব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার মানুষ চারপাশে অনেক। নিয়ম ভেঙে, ছক ভেঙে আলাদা



কিছু করতে গেলে হয়তো পরিবার-পরিজনদের রাজি করানো সকলের ক্ষেত্রেই একটু কঠিন হয়। কিন্তু জীবনের ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলো অন্তত নিজে নিন। আর হ্যাঁ, নিজেকে কিছুটা সময় দিন। নিজের জন্য খানিকটা 'মি টাইম' বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। সেই সময়টুকু আপনার সঙ্গে আপনিই নাহয় কথাবার্তা বলুন। আত্ম-সমীক্ষা করুন। ভুল করলে নিজেকেই সরি বলুন। আর ভাল কিছু করলে, অন্য কেউ প্রশংসা করুক না-করুক, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিন।

মডেল (শেষের পাতা): অনুষা, সৌমশ্রী, অর্পিতা, দেবলীনা (বাঁদিক থেকে)
প্রথম পাতার ছবি: আইস্টক
মেক-আপ: মলি হাজরা, **ফোন:** ৯৮৩০৫৫০০৭০
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ ধর

ব্যক্তিত্বের উদযাপন

নিজের খেয়াল রাখুন

নানা বয়সের অসুখ প্রতিরোধ করার উপায় কী? খাওয়াদাওয়া এবং জীবনযাপনই বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে? বিশেষজ্ঞদের থেকে মহিলাদের সার্বিক ভাল থাকার পরামর্শ নিলেন সায়নী দাশশর্মা ও মধুরিমা সিংহ রায়।

বায়োলজিক্যালি, একজন পুরুষের তুলনায় একজন মহিলার শরীর অনেকটাই আলাদা। মহিলারা বিভিন্ন বয়সে যত ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হন বা শরীরের উপর তার যা প্রভাব পড়ে, তা থেকে সুস্থ এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকতে হলে প্রয়োজন বিশেষ যত্নের। খাওয়াদাওয়া, শরীরচর্চার মতো দৈনন্দিন পরিচর্যা তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে সাধারণ অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য জটিল শারীরিক সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য দরকার সার্বিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা। কোন বয়সে কীভাবে যত্ন নেবেন, কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকবেন, জেনে নিন।

মহিলাদের কিছু কমন অসুখ

বয়সভেদে কোন কোন অসুখ মহিলাদের জন্য কমন? নিজের যত্ন নিয়ে নিজেকে প্রায়োরিটাইজ় করুন। জানাচ্ছেন ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশ্যালিস্ট, আইসিইউ ইনচার্জ অ্যান্ড মেডিক্যাল কনসালট্যান্ট ডা. দীপঙ্কর সরকার।

বায়োলজিক্যাল ক্লক মেনে চলা জরুরি

মহিলাদের ক্ষেত্রে চারটে এজ গ্রুপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্লি চাইল্ডহুড মানে দশ বছরের নীচে এবং পঞ্চাশের উপরের বয়সের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই কিছু





পিউবার্টি আর চাইল্ড বার্থ—এই দুটো সময়ই একজন মহিলার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এই দুটো সময় বিশেষ করে তাঁদের হেলদি জীবনযাপনের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। পার্সোনাল হাইজিনের দিকেও খেয়াল রাখুন।

বিষয় কমন। তা হল ছোটদের ক্ষেত্রে জন্মগত সমস্যা ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে **বয়সজনিত ক্রনিক অসুখ। কিন্তু** মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০-২৫ আর ২৫-৫০ এই দুটো সময় নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন। সব বয়সের মহিলাদের জন্য বলি, বায়োলজিক্যাল ক্লক মেনে চলা খুব জরুরি। আগেকার দিনে মেয়েদের জীবনযাপনের ধরন দেখলেই বুঝবেন, তাঁরা নিজেরা ও খানিকটা সমাজের বাকিরা তাঁদের অবহেলা করতেন। যেমন, বাড়ির পুরুষদের খেতে দিয়ে তারপর মেয়েরা খেত। বা শরীর খারাপ হলে ডাক্তার দেখাতে তাদের বড্ড অনীহা ছিল। এখন সময় পালটেছে। খাওয়াদাওয়া, বিশ্রামের সময় মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখতে পারলে ভাল। নিয়মিত এক্সারসাইজ় করাও জরুরি, তা সে আপনি যতই কাজের জন্য পরিশ্রম করুন না কেন। পিউবার্টি আর চাইল্ড বার্থ—এই দুটো সময় একজন মহিলার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এই দুটো সময় বিশেষ করে হেলদি জীবনযাপনের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। পার্সোনাল হাইজিন, পর্যাপ্ত পুষ্টির দিকে খেয়াল রাখুন। মনে রাখতে হবে, মহিলারা একটি পরিবারের স্তম্ভ। তাই, পরিবারকে ও সমাজকে সুস্থ রাখতে গেলে মহিলাদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতা জরুরি। একটি মেয়ে যখন পিউবার্টিতে পৌঁছয় তখন শরীরে নানারকম হরমোনের খেলা চলতে থাকে। সেই হরমোনাল পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আবার দ্বিতীয় আর একটি চ্যালেঞ্জ হল, বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নেওয়া। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, সবেরই প্যাটার্ন বদলে যেতে পারে। এখন অবশ্যই নিউক্লিয়ার পরিবার ও ওয়র্কিং ওম্যান—এই দুয়ের সংখ্যা বাড়ছে বলে হয়তো মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জটা একটু কম। কিন্তু কর্মরতা মহিলাদের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল ক্লক ফলো করা খানিক মুশকিল। এমনিতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি ওয়র্কলোড বহন করে। অফিস-সংসার দুয়েই কাজ করতে হয়। এসবের ফলেও নিজেদের খেয়াল রাখতে একটু অনীহা হয় তাঁদের। ছোটখাটো সমস্যাকে গুরুত্ব দেন না, এড়িয়ে যান।

কিছু কমন সমস্যা ও সতর্কতা

● **আয়রন ডেফিশিয়েন্সি:** কাঁচকলা, মোচা, থোড়ের মতো আয়রনযুক্ত খাবার খেতে হবে ১০ বছরের পর থেকেই। আমাদের দেশে আয়রনের অভাব খুবই কমন। ৩০-১১০ গ্রাম/লিটার অবধি আয়রন সাধারণত স্বাভাবিক। তবে ৩০-এর নীচে মাত্রা নামলেই তা ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতি। ১০০-র নীচে থাকলেই খানিকটা অভাব আছে বলে ধরতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হওয়ার পরে আয়রনের অভাব হতে পারে। এরসঙ্গে কনজেনিটাল অসুখ, পুষ্টির অভাবও কারণ হতে পারে। আয়রনের অভাবের পাশাপাশি অনেক মহিলাই প্রোটিন ডেফিশিয়েন্সিতেও ভোগেন। হিমোগ্লোবিন ডেফিশিয়েন্সির ক্ষেত্রেও হেলদি ডায়েট একমাত্র সমাধান। তাতে কাজ না দিলে ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিতে হতে পারে। হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা ১২-১৪। কিন্তু আমাদের দেশে ১০-এর উপরে হিমোগ্লোবিন হলেই বলি তা খুব ভাল! হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৭-এর নীচে নামলে তা অ্যালার্মিং।

● **মাসল হেলথ:** মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসল হেলথ একটি অবহেলিত দিক। আমরা ধরেই নিই, মাসংপেশির শক্তি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কম। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮-২১ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬-১৮ হওয়া

উচিত। এই মাংসপেশির শক্তি যেন বজায় থাকে। আগেকার দিকে মহিলারা বাটনা বাটতেন। এটি হাতের মাংসপেশিকে দৃঢ় করে। এখন সেসব প্রায় নেই, তার বদলে এক্সারসাইজ়ের মাধ্যমে মাসল স্ট্রেংথ বিল্ড আপ করতে পারেন।

● **থাইরয়েড ডিসফাংশন:** ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয়, যে কোনও উপসর্গই থাইরয়েডের উপসর্গ হতে পারে! থাইরয়েডের জন্য পিরিয়ড বেশি হওয়া, ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া...এসবই হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে আয়রন ও থাইরয়েড চেক-আপ জরুরি। প্রেগন্যান্সির পরিকল্পনা করলে তো আরওই জরুরি। ১০০জনের মধ্যে ৯০ জনেরই হাইপো থাইরয়েডিজ়ম থাকে। বাকি ১০ শতাংশের হাইপার থাইরয়েডিজ়ম থাকে। প্রথমটির ক্ষেত্রে থাইরয়েডের মাত্রা কম ও পরেরটিতে বেশি থাকে। হাইপার থাইরয়েডিজ়মের ক্ষেত্রে হঠাৎ ওজন কমা, কার্ডিও ভাস্কুলার সিম্পটম, ঘুম না হওয়া, হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। হাইপো থাইরয়েডিজ়মের চিকিৎসা ওষুধ দিয়েই করা হয় সাধারণত। অন্যটির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কতটা জটিল তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। এটি অনেকক্ষেত্রেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা। প্রয়োজনে সার্জিক্যাল অপশনও ভাবতে হতে পারে।

● **হার্টের সমস্যা:** চাইল্ড বেয়ারিং এজ পেরিয়ে যাওয়ার পরে হরমোনাল পরিবর্তন হতে থাকে একজন মহিলার শরীরে। এর ফলে হাইপার টেনশন, ওবিসিটি ও হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেনোপজ়ের আগের সময় অবধি ধরে নেওয়া যেত, মহিলাদের হার্টের অসুখের আশঙ্কা কম। কিন্তু এখন জীবনযাত্রা এমনই হয়ে গিয়েছে, যে কম বয়সেও হার্টের সমস্যা বাড়ছে। মেনোপজ়ের পরে হার্টের সমস্যা বাড়তে পারে। করোনারি আর্টারি ডিজ়িজ় ও হাইপার টেনশন বেশি হয়। কার্ডিয়ো মায়োপ্যাথি আলাদা করে মহিলাদের বেশি হয়, তেমনটা বলা যায় না।

● **ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন:** মেনোপজ়ের পরে ইস্ট্রোজেনের প্রতিরক্ষা বর্ম না থাকায়, ইউটিআইয়ের আশঙ্কাও এই বয়সে বেশি। পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে।

● **হাড়ের সমস্যা:** ৪০-এর উপরে হাড়ের সমস্যা বেশ কমন মহিলাদের মধ্যে। তার আগেও জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস হতে পারে। তবে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে SLE-র কথা বলতে হয়। এটি এক ধরনের অটোইমিউন ডিজ়িজ়। জয়েন্টে ব্যথা, ত্বকে প্রভাব ও কিডনি ও হার্টের উপর প্রভাব পড়তে পারে। হাড়ের সমস্যা রোধ করার উপায় বলতে এক্সারসাইজ় ও হেলদি ডায়েট। আর আর্থ্রাইটিসের সমস্যাও বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে তুলনায় বেশি।

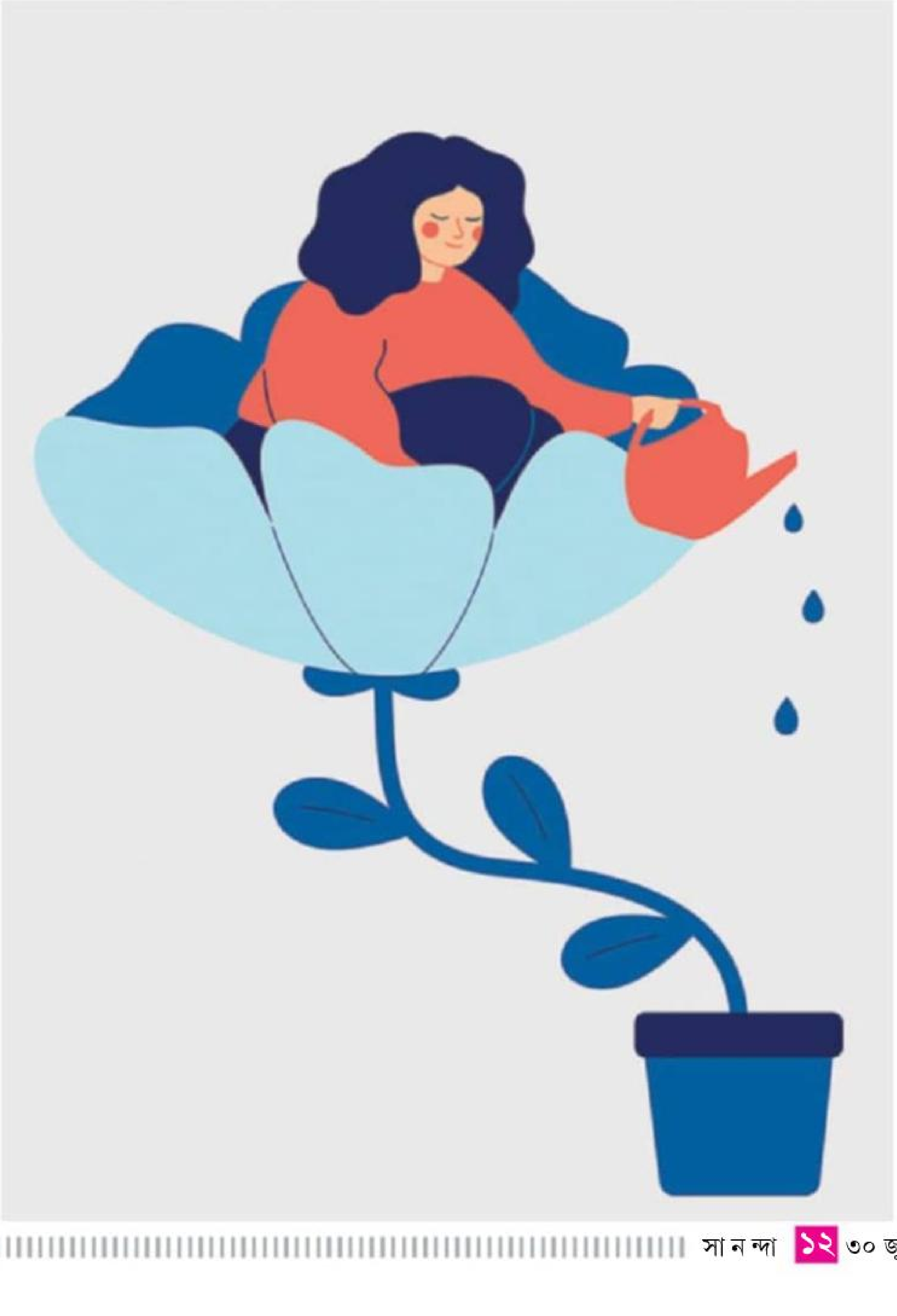
● **গলব্লাডারে স্টোন:** ৪০-এর উপরে বয়স, ওজন বেশি, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বেশি থাকলে তাঁদের গলব্লাডার স্টোনের আশঙ্কা থাকে। এর অন্যতম প্রতিরোধের উপায় জল পর্যাপ্ত খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, বায়োলজিক্যাল ক্লক মেনে চলা।

● **ভিটামিন ডি ডেফিশিয়েন্সি:** এটি কিন্তু পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। আমরা ধরে নিই সাধারণত যে একটু বয়স্ক মহিলারা মূলত বাড়ির ভিতরেই থাকেন, সূর্যের আলোয় অতটা বেরন না বলে হয়তো ভিটামিন ডি-এর অভাব তাঁদের বেশি। বা সারাদিন এ.সি-তে থাকাও একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু আরও একটি সম্ভাবনার কথা বলব। আমাদের বাড়িতে যে ওয়াটার পিউরিফায়ারের জল খাই, তা অধিকাংশ সময়ই মিনারেল-বর্জিত! আরও (রিভার্স অসমোসিস) টেকনোলজির মাধ্যমে জল সফট হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে মিনারেল কমে যায়। এ নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয় নি ঠিকই, কিন্তু একটা সম্ভাবনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

যোগাযোগ: ৯৮৩১১৭৯১৭১







নানা বয়সের গাইনিকলজিক্যাল সমস্যা

প্রায় সব বয়সের মহিলাদের মধ্যেই গাইনিকলজিক্যাল সমস্যা কমবেশি কমন। কোন বয়সে কীরকম সতর্কতা নেবেন? জানাচ্ছেন কনসালট্যান্ট অবস্টেট্রিশিয়ান ও গাইনিকলজিস্ট ডা. প্রসেনজিৎ সরকার।

প্রি টিন ও টিন এজার (১২-২০ বছর)

● শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা সাধারণত ১২বছর অবধি দেখেন। ধরে নেওয়া যাক, ওই বয়স অবধি বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানেই সন্তান থাকে, তাই সেলফ কেয়ারের জায়গা খানিকটা কম। দশ বছরের আগে সরকার নির্ধারিত ভ্যাক্সিনেশন হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আর ছোট বয়স থেকেই শারীরিক কসরত ও হেলদি ডায়েট জরুরি। প্রি টিনএজার ক্ষেত্রে চাইল্ড ওবিসিটি এখন বেশ কমন। হাই ক্যালরি জাঙ্ক ফুডের বদলে প্রি টিন সন্তান যেন প্রোটিন, ভিটামিন-মিনারেলসযুক্ত খাবার খায়। ব্যালান্সড ডায়েট শুধু ওবিসিটি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই নয়, গ্রোথের জন্যও প্রয়োজন। ছোট বয়স থেকেই পার্সোনাল হাইজিনের ব্যাপারে সন্তানকে শেখান। পরিষ্কার জায়গায় খাবার খাওয়া, খাবার

জরুরি টেস্ট

টিনএজ বয়সে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, থাইরয়েড ও ক্যালশিয়াম টেস্ট জরুরি। ভিটামিন ডি টেস্ট করাতে পারেন চাইলে। চল্লিশ বছর বয়স অবধি এই পরীক্ষাগুলো নিয়মিত করা জরুরি। চল্লিশের পরে ব্রেস্টলাইন ইসিজি, আল্ট্রাসাউন্ড, ইকো কার্ডিওগ্রাফি, রুটিন ইউরিন কালচার করানো জরুরি।

পরে হাত ধোওয়া এগুলো শেখা জরুরি।

● মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সবচেয়ে কমন ক্যানসার হল সারভাইক্যাল ক্যানসার। এটি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে হয়। যেহেতু এটি ভাইরাস থেকে হয়, তাই এই ক্যানসারের ভ্যাক্সিনও কিন্তু উপলব্ধ। ১০ বছর বয়সের পর থেকেই মেয়েদের নির্দিষ্ট ডোজে অ্যান্টি ক্যানসার ভাইরাস দেওয়া যেতে পারে, ডাক্তারের পরামর্শে। ১০ বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রথমবার শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার আগের যে কোনও সময়তেই নেওয়া যেতে পারে।



● টিন এজারদের ক্ষেত্রে (ছেলে ও মেয়ে দু'জনের ক্ষেত্রেই) ওবিসিটি একটি বড় সমস্যা। মেয়েদের ক্ষেত্রে ওজন বেশি হওয়ায় হরমোনাল সমস্যা, পিরিয়ডের সমস্যা, অতিরিক্ত ফেশিয়াল হেয়ার গ্রোথ হতে পারে। এগুলো সবক'টিই প্রায় পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের শারীরিক অভিব্যক্তি। এই সমস্যার অন্যতম ইঙ্গিত হল অনিয়মিত পিরিয়ড, ফেশিয়াল হেয়ার গ্রোথ। এই বয়সে একটি মেয়ে নিজের বডি ইমেজ নিয়ে বেশিই সচেতন থাকে। বন্ধুদের থেকে চেহারা নিয়ে কটাক্ষ শুনতে হবে বলে অনেকে স্কুলে অবধি যেতে চায় না! পিসিওএস-এর জন্য ব্যালান্সড ডায়েট, খেলাধুলো জরুরি। হরমোনাল পরিবর্তনের ফলে কারওর হয়তো একটু বেশি ব্রণ হয়। আবার কারওর হয়তো পারিবারিক সূত্রেই ফেশিয়াল হেয়ার গ্রোথ বেশি। হরমোনাল পরিবর্তন যে স্বাভাবিক বিষয়, সেই মানসিক ভরসার জায়গাটা তাকে দিতে হবে।

● পিরিয়ড হাইজিন খুব জরুরি। আজকাল স্কুলেও পিরিয়ড সম্পর্কে নানা সচেতনতা প্রোগ্রাম আয়োজন করা হচ্ছে। পিরিয়ড কতটা হলে তা হেভি? পিরিয়ডের সময় ব্যথা হলে তা অস্বাভাবিক কিনা? এধরনের নানা প্রশ্ন টিনএজারদের মনে উঁকি দেয়। ফার্স্ট পিরিয়ডের আগে সন্তানকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব বাবা-মায়েরই।

● টিনএজ কনট্রাসেপশন নিয়েও সচেতনতা জরুরি। একটা সময়ে এধরনের সচেতনতা নিয়ে ছুৎমার্গ ছিল। টিনএজারদের মধ্যে আনপ্ল্যানড প্রেগন্যান্সি সম্পর্কে জানানো জরুরি। অনেকক্ষেত্রেই হয়তো কোনও টিনএজার অ্যাক্সিডেন্টালি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়লে বাবা-মায়ের থেকে গোপন করবে, কোনও আনঅথরাইজ়ড জায়গায় গিয়ে হয়তো অ্যাবর্শন করাবে। এই অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো এড়াতেই কনট্রাসেপশন নিয়ে সচেতনতা জরুরি।

অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক (২০-৪০ বছর)

● অনেকেই স্বেচ্ছায় সন্তান নিতে চান না, তা সে বিবাহিত হোন বা অবিবাহিত। তবে সাধারণত ডাক্তারেরা বলেন, ৩০-এর মধ্যে প্রথম প্রেগন্যান্সি প্ল্যান করতে। অনেকেই হয়তো ৩০-এর পরে বিয়ে করেন, লেট প্রেগন্যান্সি হলেই যে জটিলতা হবে তেমনটা নয়। তবে আশঙ্কা খানিকটা বেশি, এই যা। ৩০-এর পরে প্রজনন ক্ষমতা দ্রুত কমতে শুরু করে। বিয়ে কখন করবেন বা সন্তানধারণ কখন করবেন, তা পুরোপুরি আপনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্তত এই সচেতনতাটুকু থাকা প্রয়োজন যে প্রেগন্যান্সির তথাকথিত আদর্শ বয়স ৩০-এর মধ্যে। আজকাল অনেকেই এগ ফ্রিজ়িংয়ের দিকে ঝুঁকতে চাইছেন। আগে স্পার্ম ফ্রিজ়িং ও এমব্রায়ো ফ্রিজ়িং করা হত। এখন প্রযুক্তি উন্নত হওয়ায় এগ ফ্রিজ়িং ও ওভারির একটি অংশ ফ্রিজ় করা যায়। যাঁরা কোনও দুরারোগ্য অসুখের জন্য প্রেগন্যান্সি নিতে পারছেন না, বা কোনও বড় অপারেশন হওয়ার জন্য সন্তান এখুনি নিতে পারবেন না...এঁদের ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা এগ ফ্রিজ়িংয়ের কথা ভাবতে পারেন।

● লেট প্রেগন্যান্সির বা সন্তানধারণ না করলে তাঁদের ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েড, ওভারিয়ান সিস্ট, এন্ডোমেট্রিয়োসিস, ব্রেস্ট টিউমারের আশঙ্কা বাড়তে পারে। তার মানে এই নয় যে, যাঁরা সময়মতো প্রেগন্যান্ট হলেন, তাঁদের এই অসুখগুলো হবে না! এই অসুখের আলাদা করে কোনও প্রিভেনশনের উপায় নেই। প্রেগন্যান্সির একটা প্রোটেকটিভ এফেক্ট আছে এই অসুখগুলোর উপরে।

● ওরাল কনট্রাসেপটিভ পিলস-এরও এই অসুখগুলোর উপর একটি প্রোটেকটিভ এফেক্ট আছে। সাধারণত কনট্রাসেপশনের কাজে ব্যবহৃত হলেও, নির্দিষ্ট ডোজে ওসিপি অন্য অসুখের জন্যও দেওয়া হতে পারে। তবে সবই ডাক্তারের পরামর্শে।

● একবার অ্যানুয়াল হেলথ চেক আপ করিয়ে নিতে পারেন। আলট্রাসোনোগ্রাফি, প্যাপ স্মিয়ার, ব্রেস্ট সোনোগ্রাফি, ব্লাড সুগার, থাইরয়েড, ডায়াবিটিস ইত্যাদি এই চেক-আপের তালিকায় সাধারণত থাকে।

● ক্যানসার স্ক্রিনিং মধ্যবয়সের মহিলাদের জন্য জরুরি। ২৫-এর বছর বয়সের পর থেকেই বছরে একবার অন্তত প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করানো প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা প্রতিবছর একবার না করাতে পারলেও, অন্তত তিনবছরে একবার করাবেন অবশ্যই। বিদেশের তুলনায় আমাদের এখানে সচেতনতা এব্যাপারে কম। আজকাল এইচপিভি ডিএনএ-এও চেক করার সুযোগ আছে। প্যাপ স্মিয়ার রিপোর্ট পজ়িটিভ আসা মানেই ক্যানসার নয়। কিন্তু এটি ইঙ্গিত দেবে যে আপনার ক্যানসার ডেভেলপ করতে পারে। তাই, অযথা ভয় পাবেন না।





মহিলাদের শারীরিক চাহিদার কথা মাথায় রাখলে, খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। বিভিন্ন বয়সে মহিলাদের শরীরে হরমোনের মাত্রায় পরিবর্তন আসে। সেই অনুসারে বদলায় পুষ্টির চাহিদা।

প্রেগন্যান্সির আগে প্রি প্রেগন্যান্সি চেক আপ জরুরি। ব্লাড সুগার, থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে অনেক সময় মিসক্যারেজ অবধি হতে পারে। কিন্তু আগেই চেক-আপ করালে সতর্ক হওয়াও সহজ। একইভাবে বিয়ের আগে প্রি ম্যারিটাল চেক-আপও জরুরি। বিশেষ করে, থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করা। বাবা-মা দু'জনেই যদি ক্যারিয়ার হন, তাহলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার হওয়ার আশঙ্কা ২৫ শতাংশ। আর রুবেলা ভাইরাস টেস্টও জরুরি।

- প্রেগন্যান্সির সময়ে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি ও প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন হতে পারে অনেকের। এগুলো নিয়েও সতর্ক থাকা দরকার।

মেনোপজ়ের আশেপাশের বয়স (৪০-এর উপরে)

মেনোপজ়ের নির্দিষ্ট বয়স আলাদা করে বলা যায় না। কিন্তু ডাক্তারি পরিভাষায়, 'মিন এজ' বলে একটি গড়পড়তা বয়স আছে। এখন মোটামুটি ৫১ বছর বয়সকে মেনোপজ়ের বয়স গড়ে ধরা হয়। কবে পিরিয়ড শুরু হবে আর কবে শেষ হবে, তা একজন মহিলার জেনেটিক কোডেই লেখা থাকে। কিন্তু তা আমরা এখনও বিজ্ঞানের সাহায্যে পড়তে পারিনি। সাধারণত, ৪০-এর আগে পিরিয়ড বন্ধ হলে বা ৫০-এর পরেও চলতে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

- ৪০-এর পরে ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিং বা ম্যামোগ্রাফি করা জরুরি। প্রত্যেক পাঁচ বছরে একবার করাতে পারেন। ম্যামোগ্রাফিতে কোনও গ্রোথ পাওয়া গেলে সেখান থেকে সোনোগ্রাফি, বায়োপসির প্রসঙ্গ আসে।
- পোস্ট মেনোপজ়াল হেলথ চেক-আপ জরুরি। এই বয়সটাতে হার্টের সমস্যা, সুগার-থাইরয়েডের সমস্যা বাড়তে পারে। হরমোনের প্রোটেক্টিভ এফেক্ট এসময়ে থাকে না।
- মেনোপজ়াল সিম্পটমেরও প্রয়োজনমতো চিকিৎসা করা সম্ভব। প্রয়োজনে বাইরে থেকে ওরাল ট্যাবলেট বা লোকালি অ্যাপ্লায়েড ক্রিম হিসেবে হরমোন শরীরে দেওয়া হতে পারে।
- মেনোপজ়ের পরে ভিটামিন ডি আর ক্যালশিয়াম ডেফিশিয়েন্সি হয় দ্রুত। যাঁদের একটু রোগা গড়ন, তাঁদের হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে দ্রুত। ৪০-এর পরে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে, রক্তে ক্যালশিয়ামের মাত্রা দেখে নিয়ে নিয়মিত ক্যালশিয়াম খাওয়া যেতে পারে। খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমেও ক্যালশিয়াম ইনটেক জরুরি।

যোগাযোগ: ৯৯০৩০৩৭৩৯০

খাওয়াদাওয়া ও শরীরচর্চা

বিভিন্ন বয়সে মহিলাদের ডায়েটারি রিকোয়ারমেন্ট এবং ফিটনেস নিয়ে বিশদ আলোচনায় এগজ়িকিউটিভ ডায়েটিশিয়ান ইন্দ্রাণী ঘোষ।

সুস্থ থাকতে খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে মহিলাদের শারীরিক চাহিদার কথা মাথায় রাখলে খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত বিশেষ কিছু নিয়ম, কিছু গাইডলাইন মেনে চলা জরুরি। বিভিন্ন বয়সে মহিলাদের শরীরে হরমোনের মাত্রায় নানা পরিবর্তন আসে এবং সেই অনুসারে বদলায় পুষ্টির চাহিদা। তাই একজন টিনএজের জন্য যেরকম খাওয়াদাওয়া বা অ্যাক্টিভিটি লেভেল উপযুক্ত, একজন মধ্য পঞ্চাশের মহিলাও যদি সেই একই রুটিন মেনে চলেন, তাহলে অজান্তেই শরীরকে নানা সমস্যার মুখে দাঁড় করাবেন। শরীর সুস্থ রাখতে এবং জটিলতা এড়াতে বয়স অনুযায়ী খাওয়াদাওয়া এবং লাইফস্টাইল প্ল্যান করুন।

জেনে রাখুন

পিরিয়ডের সময় কমবেশি তলপেটে ব্যথা অনেকেরই হয়। প্রথম এক-দুদিন একটু অস্বস্তিবোধ থাকে। এক্ষেত্রে এক-আধটা অ্যান্টি স্প্যাসমোডিক ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। মাসে দু'-তিনটে এরকম ওষুধ খেলে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যদি তাতে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে সোনোগ্রাফি করে দেখতে হবে। একইভাবে, পিরিয়ডের সময় হালকা ব্রেস্ট পেন স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যথা বেশি হলে পরীক্ষা করাতে হবে। যাঁদের পিরিয়ডের সময় খুব ক্লান্ত লাগে, তাঁদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা চেক করা দরকার।



কোন বয়সে কী প্রয়োজন?

বয়স অনুযায়ী মহিলাদের শরীরের পুষ্টির চাহিদা বদলায়। এক-এক বয়সে এক এক রকম পুষ্টি প্রয়োজন হয়, পরিমাণেও তারতম্য হয়। ১৬-২৫, ২৬-৪০ এবং ৪০-এর পরবর্তী, মোটামুটি যদি এই তিনটে এজ গ্রুপ ধরা হয়, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিউট্রিয়েন্টসের চাহিদা থাকে টিনএজ বা ইয়ং অ্যাডাল্ট মেয়েদের, অর্থাৎ যাঁদের বয়স ১৬ থেকে ২৫-এর মধ্যে। কারণ এই বয়সটা মূলত শরীর গঠনের সময়। শরীর যদি এই সময় যথাযথ পুষ্টি না পায়, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যান্য সমস্যা দেখা দেবে। ক্যালশিয়াম এই বয়সের জন্য অন্যতম জরুরি উপাদান। বয়স বাড়লেই যে একমাত্র এই মিনারেলের দরকার পড়ে, তা নয়। ভিটামিন ডি-এর কার্যকারিতা বাড়াতে বা সার্বিকভাবে হাড় ভাল রাখতে টিনএজের সময় থেকেই ক্যালশিয়ামের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আজকাল আমাদের জীবনযাপনের ধরন যেভাবে বদলাচ্ছে, তাতে অনেকক্ষেত্রেই ২০-র উপরে উঠলেই প্রেশার, সুগার, কোলেস্টেরল ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। এর মূল কারণ, এই বয়সে সঠিক ফুড হ্যাবিটস তৈরি হচ্ছে না। একদলের জাঙ্কফুডের প্রতি আসক্তি বেড়েছে, অন্যদল এতটাই স্বাস্থ্যসচেতন যে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে না। দুটোই সমান ক্ষতিকর। জাঙ্কফুডের প্রতি যাদের আসক্তি রয়েছে, তাদের জন্য পটাশিয়াম-রিচ খাবার অত্যন্ত ভাল। এতে ব্লাড প্রেশারও কমে। সেই সঙ্গে দরকার ফাইবার। সবুজ,

বয়স অনুযায়ী ডায়েট চার্ট

	১৬-২৫ (দৈনিক মোটামুটি ১৯০০ কিলোক্যালরি)	২৬-৪০ (দৈনিক মোটামুটি ১৭০০ কিলোক্যালরি)	৪১+ (দৈনিক মোটামুটি ১৫০০-১৬০০ কিলোক্যালরি)
ব্রেকফাস্ট	সিরিয়াল-দুধ/দুটো হোলগ্রেন টোস্ট, ফ্রুট স্যালাড বা গোটা ফল, একটা ডিম (সেদ্ধ, স্ক্যাম্বলড বা পোচড) / দুটো স্টাফড চাপাতি, সবজি, একটা ডিম/ এক ছোট বাটি ছানা/পনির	ওটস, আমন্ড/আখরোট গোটা ফল, ডিম / দুটো স্টাফড চাপাতি, সবজি, একটা ডিম/ এক ছোট বাটি ছানা/পনির	ওটস-দুধ, একটা ফল, ডিম/ছানা/ টোফু, গ্রিন টি
মিড মর্নিং	লস্যি/গোটা ফল/ডাবের জল /লেবুর সরবত	লস্যি/ডাবের জল	একটা ফল/ডাবের জল
লাঞ্চ	এককাপ ভাত, একবাটি টাটকা স্যালাড, ডাল, মরশুমি সবজি, মাছ/ চিকেন/পনির, টক দই	এককাপ ভাত, ডাল, মরশুমি সবজি, মাছ/চিকেন/পনির, স্প্রাউটস স্যালাড, টক দই	অল্প ভাত/একটা রুটি, একবাটি ডাল, মরশুমি সবজি, অলিভ বা ক্যানোলা অয়েল দিয়ে বানানো মাছ/চিকেন/ পনির, টক দই
স্ন্যাকস	সুপ/স্প্রাউটস/সেদ্ধসবজি/ ড্রাই ফ্রুটস/ মাখন ছাড়া পপকর্ন	টকদই ড্রেসিং দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড/ফ্ল্যাক্সসিড বা চিয়াসিডস	স্প্রাউটস/ হামাস ও হোল হুইট ক্র্যাকার্স
ডিনার	চিকেন ব্রেস্ট/বেকড সুইট পোট্যাটো, গ্রিলড ভেজিটেবলস, একটা ফল, হালকা কোনও মিষ্টি (যদি কোনও সমস্যা না থাকে)	বেকড চিকেন/ফিশ, গ্রিলড ভেজিটেবলস, একটা ফল / ওটস/দালিয়ার খিচুড়ি, মরশুমি সবজি, চিনি ছাড়া ডার্ক চকোলেট	খুব কম নুন দিয়ে গ্রিলড ফিশ/চিকেন/ পনির, ফ্লেভার্ড ইয়োগার্ট

টাটকা শাকসবজি, ফল রোজকার ডায়েটের অঙ্গ করে তুলতে হবে। সবুজ ছাড়াও, অন্যান্য রঙিন সবজি নিয়মিত দিন ওদের। ভিটামিনের মধ্যে সি এবং ই বিশেষভাবে জরুরি। টোম্যাটো, পালংশাক, পাতিলেবু, আমলকী ইত্যাদি এই বয়সের জন্য খুব উপকারী। সরাসরি খেতে না চাইলে, স্যান্ডউইচ বা পরোটার মধ্যে এই সব সবজি ভরে দিন। এক প্লেট খাবারের অন্তত অর্ধেক যেন এই ধরনের টাটকা ফলসবজিতে ভরা থাকে, তা খেয়াল রাখতে হবে। বাকিটা থাকবে হোলগ্রেন, প্রোটিন এবং ফ্যাট। রিফাইন্ড আর প্রসেসড খাবার যতটা পারেন এড়িয়ে চলুন। প্রোটিনের মধ্যে লিন প্রোটিন, অর্থাৎ চিকেন, মাছ, ডিম খান। নিরামিষের মধ্যে ডাল, টোফু, বাদাম, পনির ইত্যাদি খান। দুধ বা অন্যান্য ডেয়ারি প্রডাক্টসও দিতে পারেন। তবে তা ফ্যাট-ফ্রি হলে ভাল। কুকিজ়, ফ্রোজ়েন ডেসার্ট, চিপস, ফ্রাইজ়, সফ্ট ড্রিংকস, সুইট এনার্জি ড্রিংকস, প্রসেসড জুস, র সুগার একেবারে বাদ দিতে পারলে ভাল। নুনও পরিমিত পরিমাণে খান। ক্যানড খাবারে নুনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এই ধরনের খাবার বেশি না খাওয়াই ভাল। স্ন্যাকিংয়ের জন্য বিভিন্ন রকমের ফল বা গাজর, টোম্যাটো, শসা কেটে খেতে পারেন। বাইরে খেতে গেলে ফ্রায়েড চিকেন বা চিজ় পিৎজ়ার বদলে চিকেন স্যালাড, গ্রিলড ফিশ, ফ্রুট স্যালাড ইত্যাদি অপশন চুজ় করতে পারেন। পোর্শন কন্ট্রোল করার অভ্যেসও এই বয়সেই তৈরি করুন। বেশি খাওয়া এবং বেশি খাওয়ানো, দুটো প্রবণতাই খারাপ। পেট ভর্তি করে খাওয়ার অভ্যেস না করাই ভাল। তাতে শরীরেরই উপকার।



২৬ থেকে ৪০ বছর বয়সেও মোটামুটি এই খাবারগুলোই খাওয়া যেতে পারে। তবে এই বয়সে ক্যালরির পরিমাণ একটু কমানো জরুরি। মিড টোয়েন্টিজ়ে শরীর অনেকটাই পরিণত হয়ে যায়। ফলে গঠনগত দিক থেকে ক্যালরির চাহিদা বিশেষ থাকে না। তাছাড়া হরমোনাল পরিবর্তনও এই বয়সে এসে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে এটাকে মেনটেনিং ফেজ় বলতে পারেন। অর্থাৎ, এত বছর যদি ঠিকমতো শরীরকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে থাকেন, এই বয়সে সেটাকে ধরে রাখাটাই আপনার দায়িত্ব। অবশ্যই খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। কোন খাবারে কতটা পুষ্টি, কোন খাবার অস্বাস্থ্যকর, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকুন এবং সেই মতোই খাওয়াদাওয়া করুন। আনহেলদি ফ্যাটস অর্থাৎ, স্যাচুরেটেড ফ্যাটস বা ট্রান্স ফ্যাট পুরোপুরি বাদ দিন। মাখন, ঘি, ফ্রায়েড ফুড ইত্যাদিতে এই ধরনের ফ্যাটস থাকে। এই বয়সে কার্বোহাইড্রেটসও একটু কম খাওয়া ভাল। ভাত, রুটি বাদ দিতে বলছি না, তবে এগুলো পরিমিত পরিমাণে খান, সঙ্গে বেশি পরিমাণে রাখুন স্যালাড,



ফ্রেশ জুস ইত্যাদি। প্রোটিনে লিন প্রোটিনকে প্রাধান্য দিন। এছাড়া ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেটস রাখুন। যাঁরা প্রেগন্যান্সিতে রয়েছেন বা যাঁরা ল্যাকটেটিং মাদার্স, তাঁদের জন্য বিশেষ করে ফোলেটস বা ফোলিক অ্যাসিড খুব জরুরি একটি উপাদান। এমনিই প্রেগন্যান্সিতে ওভারঅল ক্যালরি বা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলের লেভেল একটু বেশি রাখতে বলা হয়। সেকেন্ড এবং থার্ড ট্রাইমেস্টারে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ ক্যালরি বেশি খেতে বলা হয়। তবে সেই পুরো ক্যালরিই যাতে ভাল খাবার, যেমন বাদাম, দুধ, লিন প্রোটিন থেকে আসে, তা খেয়াল রাখতে হবে। বাইরের খাবার না খেলেই ভাল। ডেলিভারির পরও ল্যাকটেটিং মায়েদের অন্তত ছ' থেকে আট মাস বাইরের খাবার, অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা জরুরি। কারণ এই সময়ও শিশু মায়ের থেকেই পুষ্টি পায়। তাছাড়া ল্যাকটেট করার সময় মায়েদের সুস্থতার জন্যও বাড়তি পুষ্টি, সঠিক খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ। ভাল মানের খাবার, যা হজম করাও সহজ এবং যাতে বেবি-বিল্ডিং নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে, এমন খাবার খেতে হবে। এই সময় হাইজিনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে আয়রন ডেফিশিয়েন্সি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দেখতে পারেন আয়রন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে কিনা। তবে আয়রন সাপ্লিমেন্টস শুধু নেওয়া যায় না। তার সঙ্গে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টস অর্থাৎ ভিটামিন ই এবং সি ও নিতে হয়, নাহলে তা শরীর অ্যাবসর্ব করতে পারে না। এছাড়া এই বয়সে ভিটামিন ডি-এর চাহিদাও বাড়ে। এখন সূর্যের আলো তো সেভাবে আমরা পাই না। ফলে ভিটামিন ডি ডেফিশিয়েন্সি হচ্ছে কিনা, তাও খেয়াল রাখুন। ভিটামিন ডি ছাড়া কিন্তু শরীরে ক্যালশিয়ামের অ্যাবসর্পশনও হবে না ঠিক করে। তাই শরীরের প্রয়োজন বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের কিছু সাপ্লিমেন্টসও রোজকার ডায়েটে রাখতে পারেন। আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খাবারের সময়। যাঁরা ওয়র্কিং বা হোমমেকারদের ক্ষেত্রেও অনেকসময় দেখা যায় যে, সময়মতো খাবার খেতে তাঁরা ভুলে যান। বা কাজের চাপে কোনও মিল স্কিপ করে যান। লাঞ্চ বা ডিনার স্কিপ করলে, তাও শরীরের কম ক্ষতি হয়, তবে ব্রেকফাস্ট কোনওভাবে স্কিপ করবেন না। হাতে সময় না থাকলে খুব সহজ কিছু খাবার, যেমন সিরিয়াল, খেজুর আর টক দই বা দুধ, কিংবা একটা গোটা ফল, কয়েকটা বাদাম আর একটা সেদ্ধ ডিম, এধরনের খাবার খেতে পারেন। এই ধরনের খাবারে কিন্তু আয়রন, কার্ব, ফ্যাট, প্রোটিন, সবই পাবেন। সকালে এরকম কোনও একটা মিল খুব জরুরি সারাদিন শরীরকে এনার্জেটিক রাখার জন্য। লাঞ্চ বা ডিনার যদি স্কিপ করতেই হয়, সেক্ষেত্রে হালকা কিছু খান। দীর্ঘক্ষণ পেট খালি রাখা ঠিক নয়। একটা গোটা ফল বা কয়েকটা ক্রিম ক্র্যাকার বা হোলগ্রেন বিস্কিট খেলেও চলবে। তারপর সময় হলে প্রপার মিল খান।

৪০-এর পর আবার শরীরে অনেকগুলো পরিবর্তন হয় একসঙ্গে। মেনোপজ়ের সময় যত এগিয়ে আসে, তত হরমোনাল লেভেল বদলাতে থাকে। ইস্ট্রোজেন লেভেল কমতে শুরু করে বলে খুব দ্রুত ওজন বাড়ে। ফলস্বরূপ কোলেস্টেরল লেভেলও বাড়তে থাকে। এছাড়া হাড়ের গঠনগত পরিবর্তন বা দুর্বলতাও এই বয়সের অন্যতম সমস্যা, যে কারণে আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য হাড় এবং সন্ধির অসুখও বেশি দেখা যায় এই সময়। হরমোনের পরিবর্তনের জন্য ঘুম ঠিকমতো হয় না। এর থেকে সুরক্ষিত থাকতে এই বয়সে ক্যালশিয়াম এবং আয়রনের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টস তো নিতেই হবে, তার সঙ্গে নিতে হবে ভিটামিন এ-ও (ডিম এবং দুধে থাকে)। ক্যালরির প্রতি বাড়তি সতর্কতা নিন। কার্বের পরিমাণ কমিয়ে শাকসবজি, ফল, দুধ, লিন প্রোটিন খান বেশি করে। মিষ্টি, ময়দা, অতিরিক্ত নুন খাওয়া বন্ধ করুন। ফ্রোজ়েন ফ্রুট বা অন্যান্য খাবার, দোকান থেকে কেনা পাঁপড়, আচার বা সল্টেড বিস্কিটও খাবেন না। দিনের শুরুতে ভাল মতো ব্রেকফাস্ট করে



লাঞ্চ এবং ডিনারে একদম হালকা খাবার খান। এই বয়সে অ্যাক্টিভিটি লেভেলও কমে যায় অনেক। তাই দিনে অন্তত আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটি বা যোগব্যায়াম করুন।

খাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন অন্তত ৮ গ্লাস বা ৩ লিটার জল খাওয়া উচিত। তবে সরবত বা কোল্ড ড্রিংকস নয়। সাধারণ জল অথবা পুদিনা, তুলসী, লেবু, শসার মতো রিফ্রেশিং উপাদান মেশানো জল খেতে পারেন। অথবা এক গ্লাস জলে ২ চা-চামচ টক দই মিশিয়ে খেতে পারেন। দই প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে গুড ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য করে। জলীয় ফল যেমন তরমুজ, আনারস, শসা ইত্যাদিও বেশি করে খান, যাতে শরীরে আর্দ্রতার ঘাটতি না হয় কোনওভাবেই।

এর বাইরে সব বয়সেই পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম (অবশ্যই বায়োলজিক্যাল ক্লক মেনে) জরুরি। ঘুমের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখুন। প্রপার স্লিপ হাইজিনও মেনে চলা জরুরি। ঘুমের সম রিল্যাক্সিং মিউজ়িক শুনতে পারেন। যখন খুশি খাওয়া, যখন খুশি ঘুম থেকেও শরীরের অনেক ক্ষতি হয়, যা আমরা বুঝতেও পারি না। শরীর সুস্থ রাখতে হলে এই ছোট ছোট অভ্যেসগুলোও কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফিটনেসের ফর্মুলা

ডায়েট তো গুরুত্বপূর্ণ বটেই, তবে শরীরচর্চা ছাড়া ডায়েট অসম্পূর্ণ। শরীরচর্চার চেয়ে বলা ভাল, অ্যাক্টিভ থাকা অভ্যেস করতে হবে। তার মানে কিন্তু রোজ জিমে যেতেই হবে, এমনটা নয়। নিত্যদিন যে কাজগুলো করছেন, তার মধ্য দিয়েও অ্যাক্টিভ থাকা সম্ভব। দিনে যদি অন্তত ৫০-৬০ মিনিট শরীরকে কোনও অ্যাক্টিভ কাজের মধ্যে রাখতে পারেন, তাহলেও উপকার পাবেন। সেটা হাঁটা, দৌড়নো, সাঁতার, সাইক্লিং, সিঁড়ি ভাঙা, যোগব্যায়াম, যা কিছু হতে পারে। মনে রাখবেন, কিছু না করার চেয়ে খুব সামান্য কিছু করাও ঢের ভাল। সারাদিন বসে না থেকে যদি ধীরপায়ে হাঁটাহাঁটি করেন বা একটু-আধটু স্ট্রেচিংও করেন, তাও কম নয়। তবে কেউ যদি ওবিস হন, তাঁদের অ্যাক্টিভিটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ওবিস হওয়ার অর্থ শুধু ওজন বাড়া নয়। বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রশ্ন তো রয়েইছে, একইসঙ্গে শরীরকে অসংখ্য জটিল সমস্যার সম্মুখীন করতে পারে বাড়তি ওজন। তাই প্রতিদিন অন্তত ৪০-৫০ মিনিট অ্যাক্টিভ থাকুন। এতে হাড়ও ভাল থাকে। একটু বয়সের মহিলাদের জন্য ব্রিস্ক ওয়াকিং বা হালকা যোগব্যায়াম ভাল। খুব ভারী এক্সারসাইজ় এই বয়সে এড়িয়ে চলুন। যদি শরীরচর্চা করতে গিয়ে কোনও রকম অসুবিধে বোধ করেন, অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যাঁরা একেবারে শরীরচর্চা করতে অভ্যস্ত নন, তাঁরা ১৫-২০ মিনিট দিয়ে শুরু করুন। একদম স্বাভাবিক গতিতে হাঁটুন, সাধারণ কিছু ব্যায়াম বা স্ট্রেচিংয়ের মতো এক্সারসাইজ় করুন। প্রতি সপ্তাহে তাতে ৫ মিনিট করে বাড়াতে থাকুন। এভাবে ৫০ মিনিট বা একঘণ্টা অবধি এক্সারসাইজ় করতে পারেন। প্রতিদিন ৫০ মিনিট নিয়মিত দেওয়া সম্ভব না হলে, অন্তত আধঘণ্টা ফিটনেসের জন্য রাখুন। একবারে আধঘণ্টা না দিলেও চলবে। সকালে-বিকেলে-রাতে দশ-পনেরো মিনিট করে শরীরচর্চা করলেও উপকার পাবেন। রাতে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে যাওয়ার আগে আধঘণ্টা পায়চারি করার অভ্যেস



করতে পারলে ভাল। এতে খাবার হজম হতেও সুবিধে হবে এবং ঘুমও ভাল হবে।

মনে রাখুন

- স্কুলে ব্যালান্সড ডায়েটের কনসেপ্ট সকলেই পড়েছেন। সেটাকে আসল জীবনেও প্রয়োগ করুন। প্রোটিন, ফ্যাট, কার্ব, ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল এবং জল, সবই যেন খাবারে ব্যালান্সড থাকে, তা লক্ষ রাখুন।
- স্মার্ট অল্টারনেটিভ খুঁজে নিন। যেমন, মাখন বা মেয়োনেজ়ের পরিবর্তে হামাস খেতে পারেন। চিপস, কুকিজ়ের বিকল্প হতে পারে টাটকা ফল, সবজি আর বাদাম দিয়ে বানানো স্যালাড
- সিম্পল কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলুন
- নুন এবং তেল খান পরিমিত পরিমাণে
- আয়রন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলিক অ্যাসিডের প্রতি গুরুত্ব দিন
- ভিটামিন এ, সি, ই, ডি সবচেয়ে জরুরি
- ব্রেকফাস্ট করতে ভুলবেন না ভুলেও
- নিয়মিত আধঘণ্টা শরীরচর্চা করুন
- রোজকার কাজ যতটা সম্ভব দাঁড়িয়ে করুন
- বিএমআই বা বডি মাস ইনডেক্স ১৯-২৫-এর মধ্যে রাখা আবশ্যক

যোগাযোগ: ০৩৩ ৬৬০০ ৩৩০০, ৯৪৩৩১৮৩৪৮৫

সময়ে-সময়ে মেডিক্যাল চেক-আপ, একটু সচেতনভাবে খাওয়াদাওয়া করা এবং সময় মেনে ঘুমনো, খাওয়া বা শরীরচর্চা করা... সুস্থ থাকার পথে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনাকে।

মডেল: রিনা, উপাসনা, অনুষা, সৌমশ্রী, অর্পিতা, দেবলীনা
মেক-আপ: মলি হাজরা
ফোন: ৯৮৩০৫৫০০৭০
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ ধর







মন ও মেয়েরা

মেয়েদের কথা ভেবে শুরু হয়েছিল যে পত্রিকা, প্রতিবছরই জন্মদিনে সেইদিকে তাই তাকিয়ে ভাবতে হয়, মেয়েদের অবস্থান সেই সময় থেকে আজ কতখানি বদলেছে। সানন্দা আজ ৩৬ বছর পেরিয়ে আসার মুখে দাঁড়িয়ে, ফিরে দেখছে প্রথম দিন থেকে আজ অবধি যাদের ভাবনায় রেখে পথচলা শুরু হয়েছিল, মানসিকভাবে তাদের অবস্থান কী? লিখেছেন পায়েল সেনগুপ্ত

আধুনিকতা, অগ্রগতি এসব নিয়ে অনেক আলোচনা বেড়েছে আজ। এমন অনেক বিষয় নিয়ে আমরা প্রকাশ্যে কথা বলছি, যা হয়তো আগে তেমন করে বলতে পারতাম না। মেয়েরা তাদের পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করে আগের চেয়ে অনেক বেশি করে নিজেদের নিয়ে ভাবতে শিখেছে। কিন্তু সত্যিই কি নিজের প্রতি, নিজেকে ভাল রাখা, স্ট্রেস ফ্রি রাখা, আত্মবিশ্বাসী রাখার প্রতি যতখানি মনোযোগ ও যত্ন তাদের দেওয়ার কথা, তা কি দিতে পারছে? উত্তরটা হ্যাঁ হলে কিন্তু প্রায়শই এই নিয়ে আমাদের লেখালিখি করতে হত না। এখনও আমাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দিতে হয়, যতখানি পথ এগিয়ে আসার কথা ছিল, ততখানি কিন্তু হয়নি। বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেরা



শারীরিক দিক থেকে দুর্বল তকমা দিয়ে কাজের জায়গায় মেয়েদের দ্বিতীয় সারিতে রাখার চেষ্টা অনেক পুরনো। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এই অজুহাতে মানসিকভাবে আপনি দুর্বল হয়ে না পড়েন।

সুস্থ ও সুন্দর না থাকলে এগিয়ে যাওয়ার কাজ সোজা হবে না। অথচ এই এগিয়ে যাওয়াই কিন্তু জীবনের মূলমন্ত্র! লক্ষ করলে দেখা যাবে, মেয়েরা নিজেদের মেলে ধরতে শিখেছে মূলত শহরে এবং কিছুটা মফস্‌সলে। প্রত্যন্ত গ্রামে মেয়েদের অবস্থা এখনও খুব ভাল নয়। আর এই মেলে ধরা বা বিকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনেকখানি জুড়ে রয়েছে শিক্ষা বা কেরিয়ার। মানসিক স্বাস্থ্য বা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তারা এখনও কিন্তু খুব বেশি খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একটু মোটা দাগের উদাহরণ হিসেবে বলাই যায়, একজন উচ্চপদস্থ আইটি কর্মীও কিন্তু বাড়িতে হয়তো সেই সম্মান পান না, যা তিনি কাজের জগতে পান। হয়তো পরিবারের লোকেরা তাঁকে খুবই টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নেন। এমন প্রায়ই দেখতে পাই আমরা। হয়তো পরিবারের মা আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, কিন্তু আপনি দেখছেন, তাঁর কোনও কাছের বন্ধু নেই। এই ধরনের দৃশ্য ও ঘটনা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু সমাধান কতটা করতে পারি আমরা? এই চেনা দৃশ্যই বা কতটা বদলাতে পেরেছি? সত্যিই জানি না। কিন্তু জানি যে, এই পরিবর্তন জরুরি। সেই কারণেই বারংবার একই বিষয়ের অবতারণা।

মেয়েদের প্রতি প্রত্যাশা

খুবই দুঃখের বিষয় যে, ভারতীয় সমাজে মেয়েদের জন্ম এখনও সর্বত্র স্বাগত নয়। এখনও কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের কাছে এখনও সমাজের কী প্রত্যাশা, তা লিখতে গিয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের সমাজের মধ্যে একাধিক স্তর রয়েছে, সেই স্তর অনুযায়ী প্রত্যাশা পালটায়। যেখানে মেয়েদের জন্ম নিয়েই সমস্যা, সেখানে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা বাতুলতা। প্রান্তীয় স্তরে এখনও মেয়ে মানেই সন্তানপালনের যন্ত্র, স্বামীর হাতের পুতুল। এই মেয়েই যখন আবার মা বা শাশুড়ির জায়গায় উন্নীত হচ্ছেন, তিনি তখন আবার হয়ে উঠছেন মেয়েদেরই প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আসলে মেয়েরা শারীরিকভাবে দুর্বল, তাদের শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই, ঘরে-বাইরে ক্ষমতা শুধু মেয়েদের হাতেই থাকবে, মেয়েদের অস্তিত্বকেই গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই...এই ধরনের মানসিকতা যেখানে কাজ করে সেখানে মানসিকভাবে মেয়েরা ভাল আছে কিনা, এই প্রশ্ন পর্যন্ত পৌঁছতে গেলেই অনেক পথ পেরিয়ে আসতে হয়। পণের দাবিতে এখনও তাদের মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হয়। সুতরাং প্রতিনিয়ত যেখানে মেয়েরা শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই করে, সেখানে তাদের ভাল থাকা একমাত্র একটাই জিনিস শুরু করতে পারে, তা হল সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার আলো পৌঁছলেই হয়তো তাদের কাছে এটা পরিষ্কার হবে যে শারীরিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবেও ভাল না থাকলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া ব্যাহত হবে। অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করেও তাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যাঁরা বুঝতে শুরু করেছেন, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও তাদের মনোযোগ বাড়ছে। সমাজের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, মেয়েরা সাবমিসিভ হবে, কোনও প্রতিবাদ করবে না, সব কিছু মেনে নেবে, সকাল থেকে রাত অবধি শুধু অন্যদের হুকুম তামিল করবে, তাদের নিজের জীবন বা ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু থাকবে না, স্বামী এবং সন্তান বিশেষত পুত্রসন্তান ছাড়া তাদের জীবনে কেউ নেই...ছোট থেকে

এই শিক্ষা বা ধারণা নিয়েই বড় হয় দেশের আশি শতাংশ মেয়ে। কাজেই শিক্ষার আলো পৌঁছলেও হয়তো তাদের ভিতর থেকে সবসময় পুরোপুরি এই শিকড় উপড়ে বের করে ফেলা যায় না। সেই কারণেই দেখা যায়, কোনও মেয়ে তার বহির্জগতে খুব সাফল্য ও সম্মান পেলেও একইরকমভাবে সাংসারিক জীবনে কোনও স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। তাঁর কাছে যথাযথ শিক্ষার আলো পৌঁছলে তিনি এই সিদ্ধান্তই নেবেন যে, সকলের আগে নিজের সম্মান ও স্বীকৃতি প্রয়োজন। তার জন্য যা করার হয়, করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা এই প্রত্যাশার ভার বহন করতে গিয়ে, ঘরে-বাইরে সমাজ নিয়ন্ত্রিত মাপকাঠিতে 'ভাল' হতে গিয়ে হতাশা ও অবসাদে শেষ হয়ে যাচ্ছেন বা খুব বেশি হলে যেমন চলছে তেমন চলুক ধরনের স্টেটাসকো বজায় রাখতে চাইছেন নিজেদের আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে। তাই সকলের আগে এই উপলব্ধি জরুরি যে, সমাজের এইসব 'ভুয়ো' প্রত্যাশার ঘাড়ে নিয়ে সারাজীবন অন্যের নিয়ন্ত্রণে নিজের জীবনকে চালাব না, সাহস করে নিজের সম্মান ও স্বীকৃতি আদায় করব! অনেক মেয়েই মনে করেন যে, আমাকে কোনও পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করছেন বা তাঁর কাছে আমি ভীষণ 'ভাল', সে যে উপায়েই হোক, সেটাই আমার নারীত্বের স্বীকৃতি, আমার ভাল থাকা। সমাজে এই ধরনের মেয়েদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাধারণত কোনও অন্য মেয়েকে সাহায্য করা তো দূরে থাক, তিনি কোনও পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত হলে তাঁরা বলেন এটি মেয়েটিরই 'দোষ'। এই মানসিকতা আসলে দীর্ঘদিনের চলে আসা পুরুষতান্ত্রিকতারই প্রতিরূপ। পুরুষদের ক্ষমতা ও সামাজিক স্বাধীনতার বীজ এমনভাবে এদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে থাকে যে, তাঁরা নিজেদের আলাদা কোনও অস্তিত্ব হিসেবে ভাবতেই পারেন না। মেয়েদের অবয়বে তাঁদের ভিতর থেকে কথা বলেন আসলে একজন রক্ষণশীল ও ক্ষমতালিপ্সু পুরুষ। সমাজের প্রত্যেক স্তরে শুধু পুঁথিগত নয়, ব্যবহারিক শিক্ষার আলো যতদিন না পৌঁছবে, ততদিন পর্যন্ত এই চিন্তার জাল থেকে হয়তো আমরা মুক্তি পাব না পুরোপুরি। তবু যত বেশি পরিমাণে মেয়েদের নিজেদের প্রতি ভালবাসা ও সতর্কতা তৈরি হয়, ততই সমাজেরও মঙ্গল। লিঙ্গের অসাম্য নিয়ে কোনও সমাজ সুস্থভাবে টিকে থাকতে পারে না।

মেয়েদের দুনিয়ার অন্দর-বাহির

মেয়েরা কেমন দেখতে হবে, সমাজ যেন কোথাও গিয়ে সেটাও নির্ধারণ করে দেয়। আসলে পুরুষের যেমন চেহারা পছন্দ, তেমন দেখতে হলেই সে মেয়ে 'সুন্দর'। ইনক্লুসিভিটি এই মুহূর্তের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হলেও প্রান্তিক সমাজে এখনও তার কোনও মূল্য নেই। ফরসা, দোহারা চেহারা, একমাথা চুল, পারফেক্ট দাঁতের সেটিং, রোমহীন হাত-পা...মোটামুটি এই ধরনের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডকেই মাথায় রেখে এসেছে পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং এই মাপকাঠিতে যিনি পড়েন না, তার মধ্যে অনেকসময় একধরনের কমপ্লেক্স কাজ করতে থাকে। সবসময়ই তাঁর হয়তো মনে হয়, আমাকে দেখতে 'ভাল' নয়, তাই কেউই আমাকে তেমন স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। নিজের কাছেও তখন গুণের বদলে বহিরঙ্গের রূপটাই বড় হয়ে ওঠে, নিজের কাছেও নিজেকে তখন তিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন না। এটাও বহুদিনের শিকড় গেড়ে থাকা মানসিকতার ফসল। এই মানসিকতা একদিনে তৈরি হয়নি। একদিনে যাবেও না। শুধু বাইরের চেহারাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করলে সেই অশান্তির শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। মনে হতে পারে, সংসারে, সঙ্গীর কাছে, কাজের জায়গায় আমি গুরুত্ব পাচ্ছি না, তার প্রধান কারণ আমার চেহারা। এই কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে আসা খুবই প্রয়োজনীয়। সম্মান বা স্বীকৃতি আসে কাজের মাধ্যমে, নিজেকে ভালবাসার মাধ্যমে। নিজেই যদি নিজেকে গুরুত্ব না দিই, নিজেকে অকারণে কোনও কিছুর জন্য দায়ী করতে থাকি, তা হলে একজন বাইরের মানুষ কেনই বা আমাকে সম্মান দেবেন! চারপাশে আরও একটা বড় পর্যবেক্ষণ রয়েছে। অনেক নারীই মনে করেন আমি সোশ্যাল বিউটি স্ট্যান্ডার্ডে ফিট করছি না বলে আমার পার্টনার অন্য কোনও মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং সে আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। এই কমপ্লেক্স একটি মেয়েকে খুব মারাত্মক একটি



মানসিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। কারও যদি অন্য সম্পর্কে যাওয়ার হয়, তিনি এমনিই সেই সম্পর্ক তৈরি করবেন। তার জন্য কোনও কিছুই কোনও অজুহাত নয়। স্থূলভাবে বলতে গেলে সোশ্যাল বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে বহুগামিতার কোনও সম্পর্ক নেই। নইলে তথাকথিত সুন্দরী সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাটদের অন্দরমহলে এত মহিলার স্থান হত না। নিজেকে ভালবাসা খুব প্রয়োজন, নিজের চেহারা থেকে শুরু করে গুণাবলি, সব কিছু নিয়ে নিজেকে আগে সন্তুষ্ট হতে হবে। মেয়েদের মধ্যে এই উপলব্ধি আসতে অনেক দেরি হয়েছে, তবে অবশ্যই এসেছে। নইলে চারপাশে ইনক্লুসিভ বডি বিউটি নিয়ে এত সাড়া পড়ে যেত না। নিজের চেহারার যত্ন নেওয়া, ত্বক-চুল এমনকী প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার সঙ্গে 'রূপ'-এর যোগাযোগ নেই। এগুলো একটি সুস্থ জীবনচর্চার অঙ্গ। ডায়েট ও ফিটনেস রেজিম ফলো করলে মস্তিষ্ক অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হবে। নিজের সম্মান, স্বীকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য সেটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি।

সাফল্যের সমীকরণ

কেরিয়ার এবং উচ্চশিক্ষায় সমাজের বিভিন্নস্তরে মেয়েদের উপস্থিতি সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়। না, পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করে একথা বলা হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতি ও সাফল্যের খতিয়ানই এই নির্ধারিত



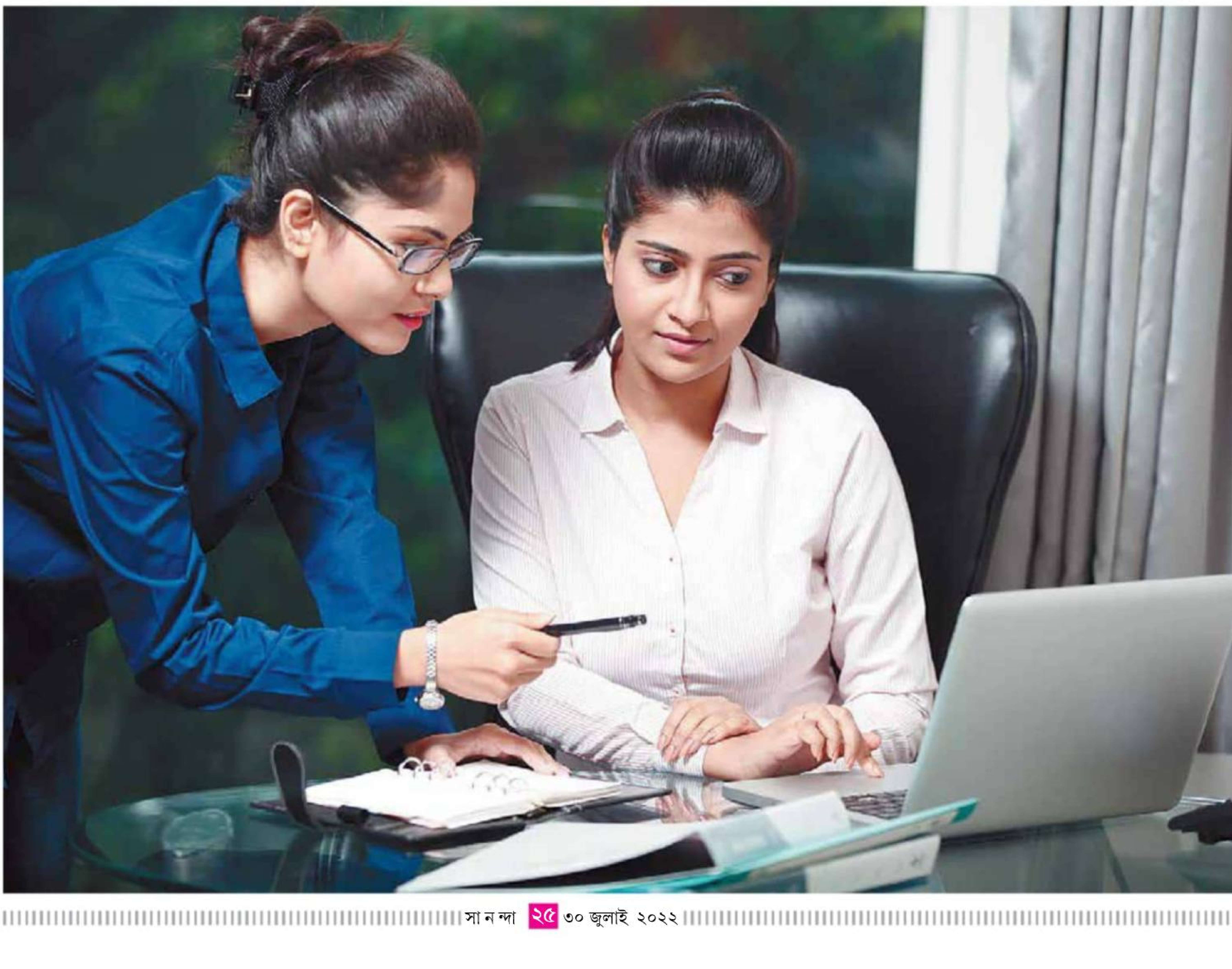


বাক্যের মাপকাঠি। তবুও দুঃখজনক ব্যাপার হল, আলাদা করে 'মেয়েদের' সাফল্য এখনও উল্লেখ করা হয়। তবে যুক্তিতে দুর্বল হলেও এর আরও একটি অনুপ্রেরণামূলক দিকও রয়েছে। কারণ ভারতীয় সমাজে মেয়েরা এখনও এতটাই কোণঠাসা যে, তাদের সাফল্যের কথা আলাদা করে না দেখালে কেউ দেখতে চান না এবং তাকে হাইলাইট করলে অন্যান্য মেয়েদের কাছেও সেটা অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্যি বলতে কী, শহরকেন্দ্রিক জগতে মানুষকে দেখতে যতই ঝাঁ-চকচকে লাগুক, তাদের মন সবসময় ততখানি পরিষ্কার হতে পারে না। সেই কারণেই কোনও মেয়ের সাফল্যকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে তার গুরুত্ব কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটা ঈর্ষাকাতর মনের পরিচয় না জেন্ডার বায়াস, সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, মেয়েদের ক্ষেত্রেই সেটা বেশি হয়। মেয়েদের উন্নতি মানেই সে কখনও তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু দিয়ে তুষ্ট করেই তবে সাফল্য পেয়েছে, একথা শুনতে হয়। বিশেষ করে পুরুষ বসের নেকনজরে কোনও মেয়ে থাকলে ধরেই নেওয়া হয় যোগ্যতা নয়, অন্য কোনও পিচ্ছিল পথেই সে পৌঁছেছে সাফল্যের শিখরে। সেই পথ কিন্তু একইভাবে ছেলেরাও ব্যবহার করে, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা হয় না বিশেষ। বহু মেয়েকে দেখা গিয়েছে মিথ্যে অভিযোগে মানসিক কষ্টে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে। এই জায়গা থেকে এখনও যখন আমরা বেরোতে পারিনি, এ ধরনের আক্রমণ আসতে পারে ভেবে নিজেদেরও অস্ত্রে শান দিয়ে রাখা ভাল। এর একটাই উপায়, হাসিমুখে অবহেলা অথবা জোর গলায় প্রতিবাদ। এই ধরনের অভিযোগে কাবু হয়ে পড়া মানে মানসিক নতিস্বীকার এবং পিছিয়ে পড়া। সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। মেয়েদের এই লড়াই কিন্তু চালিয়ে যেতে হয় ঘর-সংসার, স্কুল-কলেজ, পেশা-শিল্প-সংস্কৃতি সর্বত্র। পুরুষ অধ্যুষিত সব জায়গাতেই মেয়েদের সাফল্য প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। ইতিহাসে এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। মেয়েদের কণ্ঠরোধ করার, তাদের দ্বিতীয় লিঙ্গ করে রাখার প্রয়াস দীর্ঘদিন চলেছে। স্ত্রী-এর উন্নতি মেনে নিতে না পেরে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি তাকে সন্তানের দোহাই দিয়ে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করে।

পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে জুড়ে ঘরে-বাইরে নানা অসত্য কথা বলা হয়। মেয়ে যদি রাত করে বাড়ি ফেরে, তা হলে তো তাকে 'টার্গেট' করা আরও সহজ। মেয়েদের যোগ্যতা, চরিত্র, আত্মসম্মান সবকিছুই প্রমাণসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বা বিনা বিচারেও খারিজ হয়ে যায়। তখন কেউ মনে রাখার চেষ্টা করে না যে সেই মেয়েটির কতদিকে কত অবদান রয়েছে। শুনতে খারাপ লাগলেও ভারতীয় সমাজে এটাই বাস্তব। মেয়েদেরই যখন-তখন 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করার মানসিকতা দেখায় সমাজ। আর শুধু ভারকীয় সমাজ নয়, এখনও ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, সারা পৃথিবীতেই মেয়েদের স্যালারি সাধারণভাবে পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে কম হয়। কারণ জব অফার করার সময় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের স্কেল কম হয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু প্রতিবাদ জরুরি। অফার নেওয়ার আগে জানা দরকার একই পোস্টে অন্যান্যদের স্যালারি স্ট্রাকচার কীরকম। এইসব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে উঠতে হবে। বিষাদগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনে চরম পরিণতি ডেকে আনা সব শত্রুদেরই জয়ী করে দেয়। তাই এগুলো হবে জেনেই ব্যক্তিত্বকে প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে এধরনের মনোভাবের উপর কশাঘাত করা যায়।



স্বাধীনতা আসলে একটি স্টেট অফ মাইন্ড। এটি বাইরে থেকে আসে না কখনও, সোশ্যাল স্টেটাসও তা দিতে পারে না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, সাফল্য, ভালবাসা কোনও কিছুই মনকে স্বাধীন করতে পারে না। এটা একমাত্র পারে আপনার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা। একটি মেয়ে মানেই তার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ইমেজ থাকবে, এই অহেতুক সামাজিক প্রত্যাশা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মেয়েদের। কন্যা, ছাত্রী, কর্মী, মা, প্রেমিকা, বধূ, সহধর্মিণী...এই সব ভূমিকায় সমাজ আমাকে চাইছে। ফলে এই সব ভূমিকাতে আমি সুন্দর করে ফিট করে গেলেই আমি 'পারফেক্ট', এর মতো মরীচিকা আর কিছুই হতে পারি না। বরং আমি যেমন আছি, কিছু না করে বা করে, দেখতে সো কলড 'খারাপ' হয়ে, কোনও বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বা না হয়ে... যে কোনও অবস্থাতেই আমি 'পারফেক্ট', এই বোধকে জন্ম দিতে হবে নিজের ভিতরে। নিজেকে ভালবাসুন, ভাল রাখুন, সুস্থ থাকুন, উপভোগ করুন নিজের ব্যক্তিসত্তাকে। একা যদি না পারেন, সাহায্য নিন যাকে আপনি ভরসা করেন, পরামর্শ নিন মনোবিদের। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করুন এবং বাড়িয়ে দিন আপনার সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত, যারা চেষ্টা করেও নিজেদের ভাল রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের দিকে।



ব্যক্তিত্বের উদ্‌যাপন

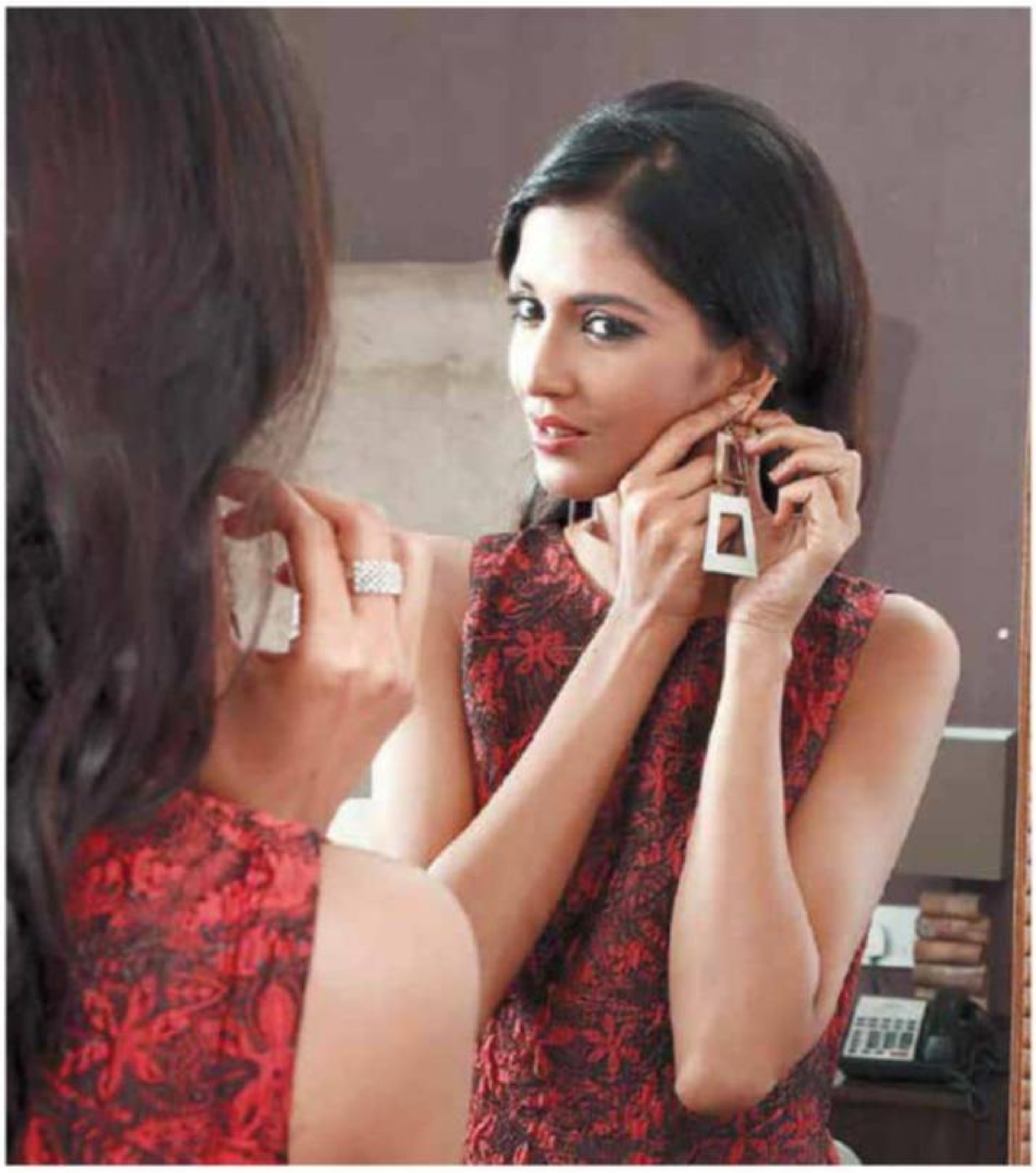
সুন্দর থাকুন নিজের শর্তে



সুন্দর থাকার অর্থ স্রেফ নিঁখুত ত্বক আর চুলের অধিকারী হওয়া নয়। বরং এই তথাকথিত ‘খুঁত’গুলোকে গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সৌন্দর্যের ভিত। আধুনিক সমাজে প্রচলিত ‘বিউটি স্ট্যান্ডার্ড’ ভেঙে নিজস্বতায় ভরসা রাখতে শেখালেন সায়নী দাশশর্মা।

“She wins who calls herself beautiful and challenges the world to change to truly see her.”
—Naomi Wolf

ছিপছিপে তন্বী শরীর, ঝলমলে চুল, মাখনের মতো মসৃণ ত্বক... সৌন্দর্য বলতে এখনও সমাজের একাংশ এই বিশেষত্বগুলোকেই বোঝেন। কারণ সমাজ আমাদের সেভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে। অথচ সৌন্দর্যের কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সৌন্দর্য মাত্রেই আপেক্ষিক, অর্থাৎ পুরোটাই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তাছাড়া শারীরিক গঠনের উপর কারওর নিয়ন্ত্রণও থাকে না। বাহ্যিক পরিচর্যায় নিজেকে প্রেজ়েন্টেবল করে তোলা নিশ্চয়ই সম্ভব বা ক্ষেত্রবিশেষে তা জরুরিও বটে। কিন্তু পুরোপুরি নিজেকে বদলে ফেলা কখনওই সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। আর সেই কারণেই





সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অবাস্তব বিউটি স্ট্যান্ডার্ডকে লক্ষ্য করে না ছুটে নিজের শর্তে সুন্দর থাকাকে প্রাধান্য দিন। অন্যের চোখে ডিজ়ায়ারেবল হয়ে উঠতে চাওয়ায় চেয়ে নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া তথা নিজেকে ভালবাসা যে অনেকবেশি জরুরি, তা ভুললে চলবে না।

অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েট

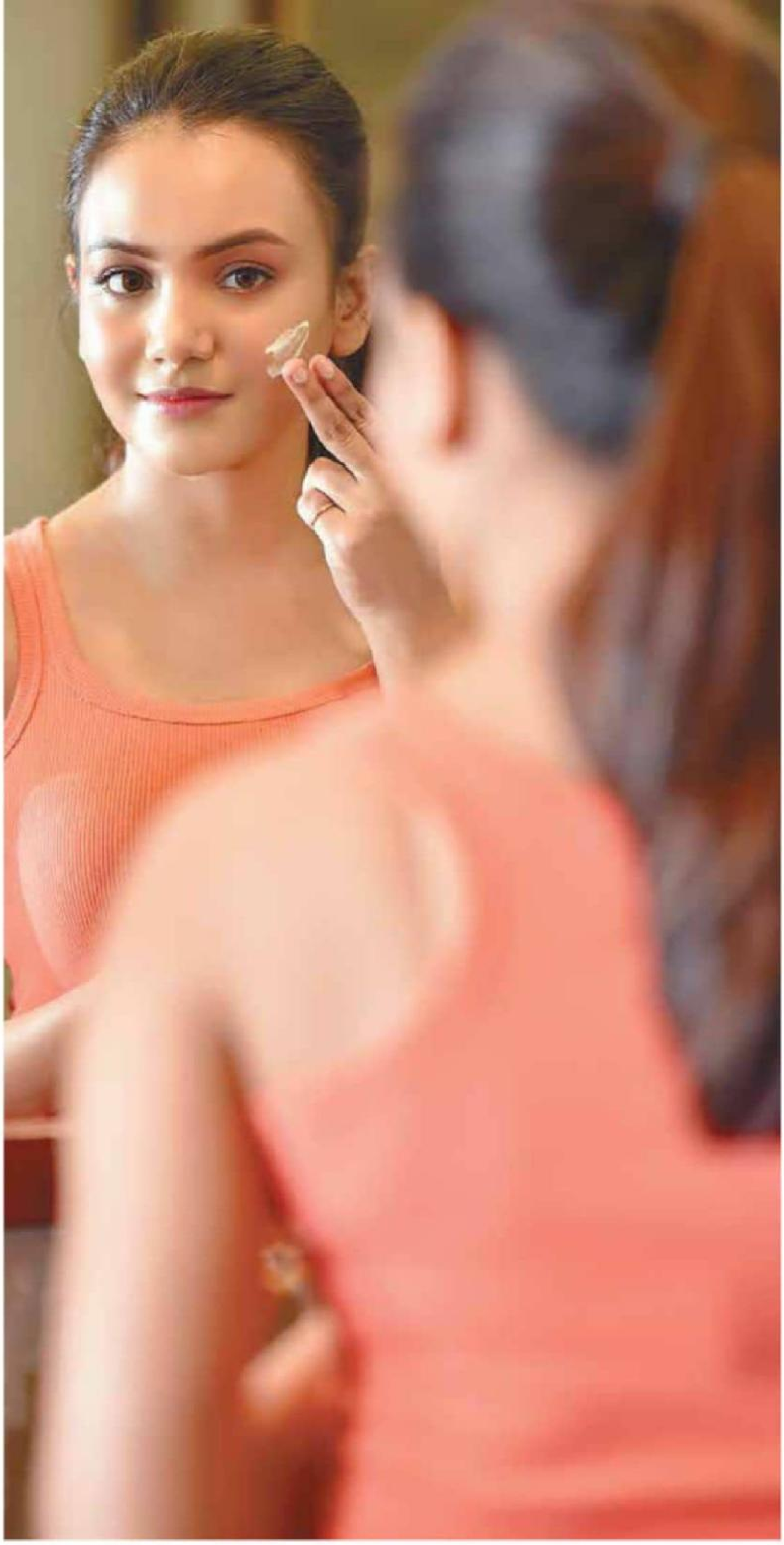
প্রথমেই বলি, বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে সমস্যা কমবেশি থাকবেই। আয়নার সামনে প্রতিদিন যে চেহারাটা দেখছেন, তা নিয়েও নানা আক্ষেপ থাকবে। কিন্তু তা যেন নিজেকে ভালবাসার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। আপনি যেমন, সেভাবেই নিজেকে গ্রহণ করতে পারা জরুরি। তার মানে এই নয় যে, সমস্যা থাকলেও তা উপেক্ষা করে যাবেন বা নিজের প্রতি কোনও যত্ন নেবেন না। নিজের নিয়ন্ত্রণে যতটুকু রয়েছে, তা তো করবেনই। তবে সবক্ষেত্রে যে প্রতিকার বা সমাধান থাকবেই, তা নাও হতে পারে। হয়তো শ্বেতী বা গভীর কোনও ক্ষত রয়েছে শরীরে। এগুলোর স্থায়ী প্রতিকার সহজ নয় ঠিকই, তবে নিজেকে এর আড়ালে গুটিয়ে নেওয়াও কোনও সমাধান নয়। ধরে নিন, ওটাই আপনার স্বতন্ত্রতার পরিচয়, যা আপনাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে। মানছি, রাতারাতি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, প্রতিনিয়ত যদি সমাজ আপনার তথাকথিত 'খুঁত'গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে, সেক্ষেত্রে নিজেকে গ্রহণ করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। খুব ছোট বয়সে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আত্মবিশ্বাসেও বড়সড় আঘাত লাগতে পারে। এক্ষেত্রে এই ধরনের বিদ্রুপ বা ব্যঙ্গকে মোটিভেশন হিসেবে দেখতে চেষ্টা করুন। বিউটি স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ধীরে ধীরে হলেও বদলাচ্ছে। এতকাল যে মাপকাঠিতে সৌন্দর্যের বিচার করা হত, আজ সেই ছক ভাঙছেন অনেকেই। নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে আপনিও যে ছক ভাঙতে পারবেন না, তা নয়। তার জন্য যে মনোবল প্রয়োজন, প্রাথমিকভাবে হয়তো তা নিজেকেই জোগাতে হবে। কিন্তু কাজটা অসম্ভব নয়। শুধুমাত্র নিজের ফ্লগুলো নিয়ে অতিরিক্ত না ভেবে নিজের ভাল দিকগুলোতেও ফোকাস করার চেষ্টা করুন। তাছাড়া আজকাল কসমেটিক সার্জারি এবং অন্যান্য অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্টের দাক্ষিণ্যে সব সমস্যারই কোনও না কোনও ধরনের সমাধান সম্ভব। একান্তই বিব্রত বোধ করলে, সেরকম কোনও সমাধানের কথা ভেবে দেখতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা না বললেই নয়। নিজস্বতা বজার রাখার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ় করাকে গুলিয়ে ফেলবেন না। হয়তো আপনি অত্যন্ত রোগা কিংবা ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেশি। কেউ তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেই যদি সেটা নেতিবাচক বা বডি শেমিং হিসেবে ধরে নেন, সেটাও ঠিক নয়। অবশ্যই কী ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে, তা মাথায় রাখতে হবে। তবে একথাও ঠিক যে শারীরিক কোনও সমস্যা না থাকলে, স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বেশি বা কম ওজন, কোনওটই স্বাস্থ্যকর নয়। মানসিকভাবে ভাল থাকার পাশাপাশি শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার প্রতিও সমান গুরুত্ব দিন।

বয়স তো সংখ্যামাত্র!

মহিলাদের বয়স ঘিরেও বিভিন্ন স্টিগমা প্রচলিত রয়েছে এই সমাজে। বিশেষত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে। এখনও একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বাহ্যিক সাজসজ্জা নিয়ে কাউকে সচেতন দেখলেই একগাদা বক্রোক্তি ধেয়ে আসে তাঁর দিকে। বয়স বেড়েছে তাই খোলামেলা পোশাক পরা বারণ, গাঢ় রং মানেই বেমানান, রূপচর্চা অনর্থক... এসব বস্তাপচা ধারণাকে যত কম প্রশ্রয় দেবেন, ততই ভাল। বরং এই বয়সে নিজের পছন্দ-অপছন্দগুলোকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিন। বয়স বাড়লে ত্বকের দৃঢ়তা কমবে, শরীরের বাঁধন আলগা হবে, চুলে পাক ধরবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। এগুলো তো আপনার অভিজ্ঞ জীবনেরই সাক্ষ্য বহন করে। এতে সংকোচ বা লজ্জার তো কিছু নেই। তাই স্টিরিওটাইপকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাল লিপস্টিকে সাহসী হয়ে উঠুন। ডিপ নেকের ব্লাউজ়ে স্বচ্ছন্দ হলে নির্দ্বিধায় তাকে আলমারি থেকে বের করে আনুন। চল্লিশেও যেভাবে নিজের দেখাশোনা করতেন, এখনও তা নিঃসংকোচে অব্যাহত রাখুন। মনে রাখবেন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যা ক্যারি করবেন, তাই আপনার ব্যক্তিত্বকে এনহ্যান্স করবে। অভ্যেস একমাত্র তখনই বদলান, যখন নিজে তাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।





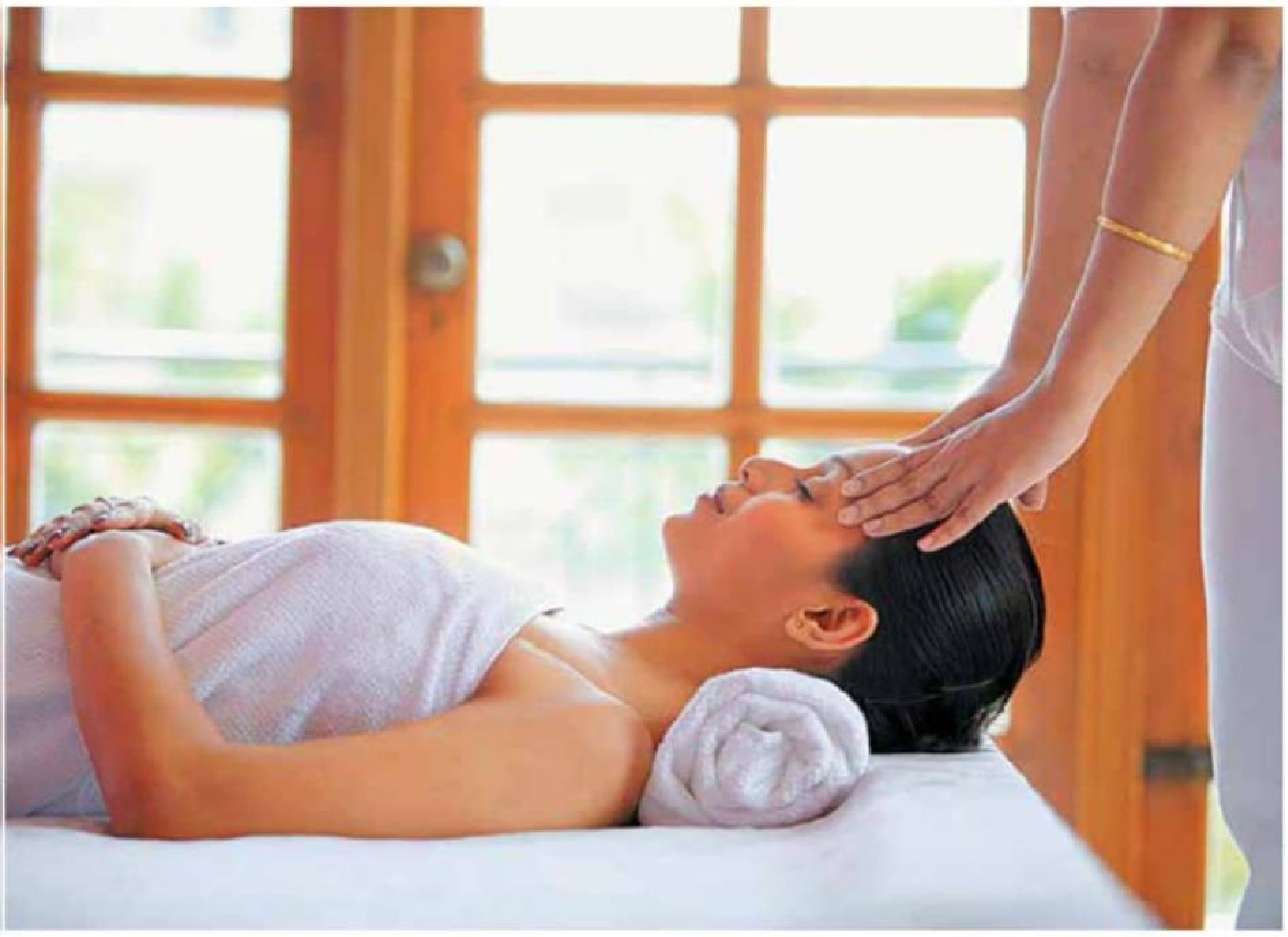
বয়স বেড়েছে, তাই খোলামেলা পোশাক পরা বারণ, গাঢ় রং মানেই বেমানান, রূপচর্চা অনর্থক... এসব বস্তাপচা ধারণাকে যত কম প্রশ্রয় দেন, ততই ভাল। বরং এই বয়সে নিজের পছন্দ-অপছন্দগুলোকে আরও বেশি গুরুত্ব দিন।



নিজেকে প্যাম্পার করাও জরুরি

এ তো গেল রাশভারী সমস্যার কথা। এবার একটু হালকা প্রসঙ্গে আসি। একটু আগেই নিজেকে ভালবাসার কথা বলছিলাম। সেল্ফ-লাভের সবচেয়ে বড় উদাহরণ কী জানেন? নিজের প্রতি সযত্ন হওয়া। প্রত্যেকটা মানুষেরই নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। তবে মেয়েদের বোধহয় সেই প্রয়োজন বাকিদের তুলনায় একটু হলেও বেশি। সমাজ আমাদের আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়, পরিবারের খেয়াল রাখতে শেখায়। কিন্তু নিজের জন্য ভাবতে বলে না। আর তাই দিনে খানিকটা সময় নিজের জন্য খরচ করতেও আমরা কুণ্ঠাবোধ করি। অহেতুক অপরাধবোধে ভুগি। অথচ অন্যকে ভাল রাখার জন্যই আরও বেশি করে নিজের খেয়াল রাখা দরকার। এরপর থেকে নিজের জন্য সময় বের করে নেওয়ার সময় এই কথাটা মনে রাখবেন। মাঝেমধ্যে বডি স্পা-তে গিয়ে রিল্যাক্সিং মাসাজ নেওয়া কিংবা হেয়ার কালার বা হেয়ারস্টাইল বদলানোর মতো সিম্পল কোনও মেকওভার নিলেও দেখবেন মন ভাল লাগছে। যদি সালঁয় যেতে না পারেন, সেক্ষেত্রে দিনে অন্তত আধঘণ্টা সময় নিজেকে দিতেই পারেন। হয়তো একটু বেশিক্ষণ ধরে স্নান করলেন। বা বিকেলে ব্যালকনিতে বসে নিজেকেই কোনও সহজ ম্যানিকিওর বা পেডিকিওর





● খুঁত মানেই খারাপ, এমনটা ধরে নেবেন না। খুঁত হিসেবে না দেখে সেগুলোকে নিজের বিশেষত্বও ভাবতে পারেন। হয়তো তা আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনার প্রমাণ। প্রত্যেকেরই এমন কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকে। তাই মিথ্যে পারফেকশনের পিছনে ছুটবেন না। মনে রাখবেন, ইটস আওয়ার ফ্লজ়, দ্যাট মেক আস স্পেশ্যাল।

শেষে বলব, সমাজের নির্ধারিত বডি ইমেজ, বিউটি স্ট্যান্ডার্ড বা শারীরিক গঠনকে আইডলাইজ় করা বন্ধ করুন। বরং ইম্পারফেকশনকে নর্ম্যালাইজ় করে তোলার প্রতি গুরুত্ব দিন। একজনও যদি আপনাকে দেখে মনে জোর পান, সেটাই বা কম কী!

মডেল: রিনা
মেক-আপ: মলি হাজরা, **ফোন:** ৯৮৩০৫৫০০৭০
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯৯০০
তৃতীয় পাতার ছোট ছবি: শুভদীপ ধর
প্রথম পাতার ছবি: আইস্টক

দিলেন। আসল কথা হল নিজের সঙ্গে সময় কাটানো এবং গতে বাধা জীবন থেকে অল্প সময়ের জন্য বিরতি নেওয়া। এছাড়া রোজকার যত্ন, দিনে-রাতে পরিচর্যা তো রয়েইছে।

মনে রাখুন

● হঠাৎ একদিন দিনরাত এক করে যত্ন নিলে হয়তো সাময়িকভাবে মন ভাল হবে। তবে যদি বাহ্যিক উপস্থিতিতে পরিবর্তন দেখতে চান, সেক্ষেত্রে নিয়মিত যত্নের কোনও বিকল্প নেই।

● খুব ইলাবোরেট রেজিম ফলো না করলেও হবে। তবে বেসিক ক্লেনজ়িং, টোনিং, ময়শ্চারাইজ়িং এবং চুলের জন্য অয়েল মাসাজ, সপ্তাহান্তে ডিম, কলা, পাতিলেবুর মতো উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে বানানো কোনও নারিশিং প্যাক এবং নিয়মিত শ্যাম্পু-কন্ডিশনার-সেরাম অবশ্যই ব্যবহার করুন।

● বয়স হলে ত্বক আর চুলের চাহিদা বদলাবে। মরশুম ভেদেও ত্বকের ধরন বদলাতে পারে। সেই মতো যত্ন নেওয়া জরুরি।

● যে কোনও সেল্ফ কেয়ার রুটিনেই হাইজিন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এক্সপায়ার্ড প্রডাক্ট বাতিল করা, স্যানিটেশন মেনটেন করা এবং নিয়মিত চিরুনি, মেক-আপ ব্রাশ, পাফ ইত্যাদি পরিষ্কার করার অভ্যেস রাখুন।

● যা আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, যেমন শারীরিক গঠন বা গায়ের রং, তা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা যুক্তিহীন। সমাজ তো বরাবরই স্টিরিওটাইপ করায় অভ্যস্ত। চিরাচরিতের বাইরে সবই তার চোখে অস্বাভাবিক। কিন্তু ভাবলেই তো সেগুলো সত্যি হয়ে যায় না। যতদিন না আপনিও মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করতে শুরু করছেন, ততদিন তা নিছক ধারণা হয়েই থাকবে।

● প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে যে নিখুঁত মুখগুলো দেখে হীনমন্যতায় ভোগেন, সেগুলো প্রায় সবই 'ফিল্টার্ড' বা ভারী মেক-আপে ঢাকা। এই ধরনের মেকি সৌন্দর্যের মোহে না জড়িয়ে বরং নিজের স্বকীয়তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করুন।





ব্যস্ততা থেকে মুক্তি

সকাল থেকে রাত অবধি কাজের চাপে মাথা তোলার উপায় নেই? একটু বুদ্ধি করে প্ল্যান করলেই কিন্তু ব্যস্ততাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। রইল কৌশল।

ব্যস্ততা কর্মজীবনের অঙ্গ। কিন্তু তা যদি স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি বইকী! কর্মব্যস্ততা অনেক কারণে বাড়তে পারে। অনেকগুলো ছোট ছোট কাজ জমে গেলেও যেমন চাপ বেড়ে যায়, তেমনই একটা বা দুটো সময়সাপেক্ষ কাজও দিনভর ব্যস্ত রাখতে পারে আপনাকে। আবার একসঙ্গে ছোট-বড় কাজ জমে গেলেও সামলানো কঠিন হয়ে যায়। যে ধরনের ব্যস্ততাই হোক, ঠিকমতো স্ট্র্যাটেজাইস করলে কিন্তু সময়মতো কাজ শেষ করা খুব কঠিন নয়। এরপর থেকে একসঙ্গে একগাদা কাজ জড়ো হলে, কয়েকটা টিপস ট্রাই করতে পারেন।

- যা যা কাজ হাতে রয়েছে, তার একটা লিস্ট রাখুন। কাজের প্রোগ্রেস অনুযায়ী প্রতিনিয়ত সেই লিস্ট আপডেট করতে থাকুন। সব কিছু যদি মনে রাখার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে ব্রেন ক্লাটার্ড হয়ে থাকবে এবং চাপও বাড়বে।
- বড় কাজ বা সময়সাপেক্ষ কাজগুলোকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে নিন। প্রতিদিন বা কয়েক ঘণ্টার হিসেবে ছোট ছোট গোল সেট করুন। তারপর একটা করে শেষ করুন। ধরুন, এক সপ্তাহের মধ্যে ৫০ পাতার একটা এক্সেল শিট চেক করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিন দিনরাত এক করে না খেটে ১০ পাতা করে পাঁচদিনে চেক করুন।
- প্রায়োরাটাইজ় করুন। যে কাজ যত বেশি ক্রিটিক্যাল, তাকে প্রায়োরিটি লিস্টে তত উপরে রাখুন। এতে স্ট্রেস কমবে। সব কাজই যদি ক্রিটিক্যাল হয়, সেক্ষেত্রে ডেডলাইন অনুযায়ী বা ক্লায়েন্টের গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলোকে সাজিয়ে নিন।
- পার্সোনাল ডেডলাইন রাখুন। অনেকসময় অজান্তেই আমরা কিছু কিছু কাজে অতিরিক্ত সময় নিয়ে ফেলি। তাই কোন কাজে কতটা সময় খরচ করছেন, তার একটা লগ রাখতে পারেন। এতে বুঝতে সুবিধা হবে যে, কোথায় বেশি নজর দিতে হবে। দিনের যে সময়টায় বেশি প্রডাক্টিভ থাকেন, সেই সময়ে কঠিন বা বেশি কাজ রাখতে পারেন।
- অনেকসময় ব্যাক-টু-ব্যাক মিটিং থাকলেও কাজের সময় পাওয়া যায় না। এর জন্যও নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। যদি ইন-পার্সন মিটিংয়ের প্রয়োজন না থাকে, সেক্ষেত্রে ভার্চুয়াল মিটিং করে যাতায়াতের সময় বাঁচাতে পারেন। অথবা, মিটিংয়ের বিষয়, বিশদ, সময়সীমা ইত্যাদি আগেভাগেই সকলকে পাঠিয়ে রাখুন, যাতে সময়ে সবটা শেষ করতে পারেন।
- নিজের কর্মক্ষমতার প্রতি রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচ রাখুন। আপনি তো মেশিন নন, সুতরাং আপনারও কাজ করার নির্দিষ্ট সীমা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই মাত্রাতিরিক্ত কাজ ঘাড়ে নিলে ব্যস্ততা পিছু ছাড়বে না কোনওদিনই। প্রতিদিন কতটা কাজ করতে পারবেন, সেই বিষয়ে সৎ থাকুন। প্রতিদিন যে একই পরিমাণ কাজ করবেন, তা নয়। হয়তো কোনওদিন দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ একটু বেশি। সেদিন অফিশিয়াল কাজ কম রাখুন। আবার রোজনামচার কাজ না থাকলে একটু বেশিক্ষণ ধরে অফিসের কাজ সেরে নিন। তবে এতেও ব্যস্ততাকে কাবু করতে না পারলে, অবশ্যই কাজ ডেলিগেট করে দিন।

মনে রাখবেন, একটানা ব্যস্ততা প্রডাক্টিভিটি এবং এফিশিয়েন্সি, দু'টোতেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ব্যস্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এতে ক্লান্তিও কমবে, আর কাজের প্রতি একঘেয়েমিও তৈরি হবে না।



রূপচর্চার গোড়ার কথা



কোন ত্বকে কোন ধরনের প্রডাক্ট কার্যকরী? কী কী প্রডাক্ট ব্যবহার করা জরুরি? ত্বকের যত্ন সংক্রান্ত এমনই নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানালেন রূপ বিশেষজ্ঞ শেহনাজ় হুসেন।



রোজকার রূপচর্চায় কোন কোন প্রডাক্ট রাখা বাঞ্ছনীয়? সকালে এবং রাতে কি আলাদা ধরনের প্রডাক্ট ব্যবহার করা উচিত? মুখের কোন অংশগুলোর প্রতি বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি? শুনেছি, একটানা একই প্রডাক্ট ব্যবহার করলে নির্দিষ্ট সময় পরে তা আর কাজ করে না। একথা কি সত্যি? উত্তর পেলে খুশি হব।

অর্যমা নন্দী, সল্টলেক

রূপচর্চার জন্য প্রডাক্ট বাছার সময় ত্বকের ধরনের কথা অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত। প্রধান প্রডাক্টের মধ্যে অবশ্যই ক্লেনজ়ার, টোনার, ময়শ্চারাইজ়ার, ফেসপ্যাক এবং সানস্ক্রিন রাখা জরুরি। শরীরের যে অংশ রোদে উন্মুক্ত থাকে, সেই প্রতিটি অংশের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন। মুখ ছাড়াও, ঘাড় এবং গলা, হাত, পায়ের পাতা ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার এবং ময়শ্চারাইজ় করুন। বাইরে বেরোলে এই প্রতিটা অংশেই সানস্ক্রিন লাগান। রাতে আবারও ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। এরপর শুকনো ত্বকে ক্রিম মাসাজ করে ভিজে কটন প্যাড দিয়ে আলতো করে মুছে নিন। তৈলাক্ত ত্বকে রাতে ক্রিম লাগানোর প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক এবং শুষ্ক ত্বক ক্লেনজ়িং জেল বা ক্রিম দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। মিশ্র ত্বকের জন্য ক্লেনজ়িং মিল্ক বা লোশন ব্যবহার করতে পারেন। স্বাভাবিক থেকে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য সাধারণ ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন এবং যদি অ্যাকনের প্রবণতা থাকে, সেক্ষেত্রে মেডিকেটেড ক্লেনজ়ার ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। স্বাভাবিক থেকে তৈলাক্ত ত্বক পরিষ্কার করার পর হালকা ময়শ্চারাইজ়িং লোশন অ্যাপ্লাই করুন। শুষ্ক ত্বক হলে ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। সানস্ক্রিনের ক্ষেত্রেও তৈলাক্ত ত্বকে জেল-বেসড এবং শুষ্ক ত্বকে লোশন-বেসড প্রডাক্ট ব্যবহার করুন। এবার আসি প্রডাক্টের কার্যকারিতার প্রসঙ্গে। অনেকের ত্বকে দীর্ঘদিন এক প্রডাক্ট ফলদায়ী হয় না ঠিকই, তবে সবার ক্ষেত্রেই যে তা হবে, সেরকম নয়। অর্থাৎ, আপনার ক্ষেত্রে যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরও কোনও প্রডাক্ট ফল দেয়, তাহলে তা ব্যবহার করতেই পারেন। তবে মরসুম অনুযায়ী অনেক সময় ত্বকের ধরন বদলে যায়। এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। ত্বক কী চাইছে, সেটা বুঝে সেই মতো যত্ন নিন।

প্রশ্ন পাঠান: sananda@abp.in



ওটিটি-তে তিনি এখন জনপ্রিয়তম অভিনেতাদের একজন। 'পঞ্চায়েত'-এর অপার সাফল্যের পরে 'জাদুগর'-এও একইরকম প্রশংসিত জিতেন্দ্র কুমার। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

মেটেরিয়ালিস্টিক বিষয়ে মিনিম্যাল থাকতে চাই

'পঞ্চায়েত'-এর দুই সিজ়নই অসম্ভব জনপ্রিয়। তারপর 'জাদুগর'-এও আপনার কাজ প্রশংসিত হচ্ছে। সবমিলিয়ে কেরিয়ারের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বলা চলে...

হ্যাঁ, এটা বলতে পারি এখনও অবধি আমার জার্নির এটাই বোধহয় সেরা অধ্যায়। যেটা করতে এসেছিলাম, সেটাই এখন করতে পারছি। দশ বছর আগে যেধরনের গল্প পরদায় বলার স্বপ্ন দেখতাম, তা এখন বলতে পারছি। 'পঞ্চায়েত', 'জাদুগর'...সব মিলিয়ে দারুণ অনুভূতি।

'জাদুগর'-এ আপনি একজন ম্যাজিশিয়ানের চরিত্রে। চরিত্রের জন্য তো ম্যাজিকও শিখতে হয়েছিল আপনাকে?

আমাদের ম্যাজিকের সব ওয়র্কশপ অনলাইনে হত। কোভিডের সময় ছিল তখন। প্রচুর ম্যাজিক ট্রিক শিখেছিলাম। তারপর একদিন রিহার্সাল হল, ক্যামেরায় কোন কোন ট্রিক ভাল লাগবে দেখতে। আমাকে কোন ম্যাজিক ট্রিকে বেশি কমফর্টেবল লাগছে ক্যামেরায়, কোন ম্যাজিক পরদায় দেখালে বেশি ইমপ্যাক্টফুল হবে...এসব নিয়ে বেশ লম্বা সময় ধরে ওয়র্কশপ আর রিহার্সাল চলেছিল। ফিল্মে একটা দৃশ্যে মঞ্চে বড় প্রপ নিয়ে ম্যাজিক দেখাতে হয় আমাকে। তার জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। কোভিডের প্রথম ঢেউয়ের সময়েই কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রস্তুতি দ্বিতীয় ঢেউয়েও

চলছিল...বুঝতেই পারছেন কতদিনের পরিশ্রমের ফল! লকডাউনে বাড়িতে বসে থাকলেও বেশ কাজ হয়েছে তাতে। ম্যাজিক শিখছিলাম, অনলাইন স্ক্রিপ্ট রিডিং চলত। প্রথম ঢেউয়ের পর শুটিং শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা। দ্বিতীয় ঢেউয়ে আবার শুট বন্ধ হয়ে যায়। তবে অপেক্ষা খুবই ফলদায়ক হয়েছে। যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমনই রেসপন্স পাচ্ছি দর্শকদের থেকে। কমেডি, ইমোশন, রোম্যান্স...এতকিছু এক ছবিতে গেঁথে দেওয়া সহজ কাজ নয়। লোকে যে এই ছবির সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছেন, সেটাই বড় ব্যাপার।

'পঞ্চায়েত' সিজ়ন ওয়ানের পর থেকেই আপনি ওটিটি-র অন্যতম 'সট আফটার স্টার'। তারপরে তো 'চমন বাহার', 'শুভ মঙ্গল জ়াদা সাবধান', 'জাদুগর'...জীবন কতটা বদলেছে এই ক'বছরে?

কাজের দিক থেকে অনেকটা বদলেছে। অনেক পরিচালক দারুণ সব গল্পের জন্য অ্যাপ্রোচ করছেন। অনেক গল্প শুনছি, বেছে নিতে পারছি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে সেভাবে পরিবর্তন হয়নি। যেমন ছিলাম, তেমনই আছি (হাসি)।

আপনার ইনস্টা বায়োতে লেখা আছে 'মিনিম্যাল'। অল্পেতে সন্তুষ্ট তাহলে?

সবসময়ই অল্পেতে বাঁচতে চেয়েছি। মানে, যে জিনিসের প্রয়োজন নেই সেগুলো কেনার বা বাড়িতে রাখার কী দরকার! তবে একথা কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মেটেরিয়ালিস্টিক বিষয়ে মিনিম্যাল থাকতে চাই।

এখন সিনেমাতে বা ওটিটি-তে ছোট ছোট শহরের গল্প উঠে আসছে। আপনি নিজেও সেরকম একাধিক গল্পের অংশ। কী মনে হয় এই নতুন ট্রেন্ড সম্পর্কে?

আমি শুরুটা করেছিলাম 'পিচারস' দিয়ে। স্টার্ট-আপ ওয়র্ল্ডের গল্প। সেটি একেবারেই স্মল টাউন স্টোরি ছিল না। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সিরিজ়। তবে, আমার মনে হয় ছোট শহরে গল্প প্রচুর আছে। প্রচুর গল্প বলা এখনও বাকি আছে। 'জাদুগর'-এর কথাই ধরুন। একটি পাড়ার ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গল্প। সেখান থেকে ম্যাজিক...এই গল্পকে আপনি সিনেম্যাটিক্যালি বলতে পারেন। কমেডি, ইমোশন সবই রাখতে পারেন। স্মল টাউনের গল্পে অনেক দিক এক্সপ্লোর করা যেতে পারে। আমার চেষ্টা থাকবে, যতধরনের গল্প বলা সম্ভব, বলব। সবধরনের, সব জঁরের গল্প বলতে চাই। অনেক ইন্টারেস্টিং চরিত্র, গল্প আসছেও আমার কাছে।



'জাদুগর'-এ জাভেদ



আইআইটি থেকে বেরনোর পর, অত ভাবিনি যে ঝুঁকি না নিলে কী হবে ইত্যাদি। জীবন যেমন সুযোগ দিয়েছে তেমনই এগিয়েছি। তবে হ্যাঁ, একটা সময়ের পর আমায় সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছিল। দু-তিন বছর অভিনয় করার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, অভিনয়ই করব।

জাফরি, 'পঞ্চায়েত'-এ রঘুবীর যাদব, নীনা গুপ্তার সঙ্গে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতার কথা একটু বলুন...

যাঁদের কাজের ফ্যান, তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারার আনন্দই আলাদা। প্রচুর শিখতেও পেরেছি। এঁরা বাদেও যে সিনিয়র অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছি প্রত্যেকের জন্যই এটা বলব। ওঁদের জীবনে প্রচুর গল্পও আছে। ওই গল্পগুলো, ওঁদের জার্নিগুলো শোনার-জানার চেষ্টা করি। খুব ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে এঁদের সঙ্গে।

সকলেই জানেন আপনি আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র। মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন আইআইটি-তে পড়াশোনা ও তারপরে মোটা মাইনের চাকরি। সেখান থেকে অভিনয়ে আসার সময়ে বাড়ি থেকে আপত্তি করেননি কেউ?

হ্যাঁ, শুরুর দিকে একটু অসুবিধে হয়েছিল ওঁদের রাজি করাতে। ওঁদের মনে হত, আমি এত পরিশ্রম করেছি আইআইটি যাওয়ার জন্য, চারটে বছর কাটিয়েছি...সেখানে এমন একটা জগতে যাচ্ছি যার কোনও ট্রেনিং নেই। কোনও চেনাশোনা নেই। তবে বোঝানোর চেয়েও আমি কাজে করে দেখাতে চেয়েছিলাম। প্রথমবার সুযোগ পেলাম যখন ওঁরা বললেন, 'ঠিক আছে ট্রাই করে দ্যাখো।' তারপর কাজ আসতে লাগল। খানিকটা ভাগ্যবান বলতে পারেন, সেই সময়ে ইউটিউব এসে গিয়েছিল। আমাদের কাজের আলাদা অডিয়েন্স তৈরি হতে লাগল। যখন বাড়ির লোকেরা কাজ দেখলেন, তখন আত্মবিশ্বাস পেলেন। আর সাপোর্টও করতে শুরু করলেন।

আপনার মনে হয়নি একটু ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে?

আসলে আমি অত ভাবিনি ঝুঁকি না নিলে কী হবে বা কোনও নিরাপদ চাকরি করতে হবে কিনা। হ্যাঁ, ভাল চাকরি পেলে ঠিক আছে। কিন্তু তা না পেলে তো এমনিও কিছু না কিছু করতে হবে। তখন এমন কিছু মানুষকে চিনতাম, যাঁরা ইউটিউবে ভিডিও বানাচ্ছিলেন। অত ভাবিনি, জীবন যেমন সুযোগ দিয়েছে তেমনই এগিয়েছি। তবে হ্যাঁ, একটা সময়ের পর আমায় সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছিল। দু-তিন বছর অভিনয় করার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, অভিনয়ই করব।

এরপরে কী আসছে?


প্রচুর ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট আসছে। ওটিটি, ফিচার সবকিছুই আসছে।

শুটিং, রিহার্সাল না থাকলে কী করেন?

খেলতে ভাল লাগে। ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট খেলি। এখন বই পড়ি অনেক। বেশ কিছু নতুন বই আনালাম। নতুন কিছু এক্সপ্লোর করতে সবসময় ভালবাসি।

কলকাতায় নিশ্চয়ই আসা-যাওয়া আছে?

হ্যাঁ, খড়গপুর থেকে বেশি দূরে তো ছিল না। মাঝেমাঝেই চলে আসতাম। প্রচুর স্মৃতি আছে। কলেজ শেষ হওয়ার পরেও ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বছরে অন্তত একবার কলকাতায় আসতামই। তারপরে কোভিডের জন্য হয়নি। আবার দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি আসতে পারি...



আপনাদের পাঠানো ট্রাভেল ফোটো থেকে সেরা ১০টি বেছে নিয়েছিলাম আমরা। সেরা বাছাই ছবিগুলি রইল এই সংখ্যায়।

আরও যাঁদের ছবি ভাল লেগেছে : দীপশ্রী সাঁতরা, জন মণ্ডল, যুহিতা ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্ক্ষী দেব, রূপা বসাক, সমীর ঘোষ, সময়িতা শীল, শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা দাস, সুহিতা নাগ, সুপ্রিয় সাহা

নীলপাহাড়ির দেশে যা...


নীল জলের বুকে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুঙ্গস্পর্শী নীল পাহাড়। দেখা যাচ্ছে একচিলতে আকাশও। নীল রঙে রিলিফ এনেছে জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা নানা রঙের বাড়ি। অস্ট্রিয়ার হ্যালস্ট্যাটে ছবি তুলেছেন অন্বেষা বিশ্বাস।




এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে...

ছাই-রঙা মেঘ যেন কুয়াশার পরদার মতো ঢেকে রেখেছে নীচের সবুজ ও খয়েরিকে। তারই বুক চিরে ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ, অবিরল জলধারা। চেরাপুঞ্জির নোখালিখাই ফলসের ছবি ধরে রাখলেন মনীশ হক।







ঠিক সন্ধে নামার মুখে

সন্ধের আকাশের ক্যানভাসে যেন কোনও শিল্পী নিপুণ তুলির কাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন গোধূলির আলো। জলের কোলে ছড়িয়ে আছে নৌকোরা। ধীরে ধীরে আঁধার নামছে কানাডার টরন্টোয়। সাঁঝবেলার ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখলেন দেবারতি চক্রবর্তী।



চলো যাই চলে যাই

চারপাশে বরফে মোড়া পাহাড়। তার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গাছের সারি। পাহাড়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে ঘাসে ঢাকা জমি। সেই জমিতে চরে বেড়াচ্ছে ওরা কারা? কাশ্মীরের গুলমার্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য বন্দি করলেন পাপিয়া চৌধুরী।







জলের রং সবুজ

সবুজ জলের বুকে ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র পাথর। জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ওটা মাছ নয়, নৌকো! জলযাত্রার আনন্দ নিচ্ছেন পর্যটকেরা, মেঘালয়ের শনংপেডংয়ে। সেই মুহূর্তের ছবি তুলেছেন রোহিত রায়।


লাল-নীল-সবুজেরই মেলা রে...

নীল আকাশে পাল তুলেছে সাদা মেঘের ভেলা। টলটলে জলের ধারে একলা দাঁড়িয়ে নানা রঙে রাঙানো ডিঙি। ঠিক যেন আঁকা ছবি! পুরুলিয়ার ফুটিয়ারি ড্যামের দৃশ্য লেন্সবন্দি করলেন সৌভিক রক্ষিত।






প্রভু আমার, প্রিয় আমার

কাম্বোডিয়ায় আঙ্কোরভাট মন্দিরের বাইরের দৃশ্য। নীল জলের স্নিগ্ধ ছবি শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে যেন রোজকার জীবনের ক্ষুদ্রতা, অশান্তি, ইঁদুরদৌড় থেকে মনকে নিয়ে যায় অনেক দূরে। ছবি তুলেছেন শীর্ষেন্দু গায়েন।


সাগরতীরে মরুর জাহাজ

সারাদিনের পালা চুকিয়ে আরও একবার পাটে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন সুয্যিমামা। সোনালি সন্ধে ছায়া ফেলেছে নীল সমুদ্রে। বালির বুকে পর্যটকদের নিয়ে ঘুরছে মরুর জাহাজ উট। ছবি, রনি চক্রবর্তীর।







দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্জয়


দুই পাশে দুই পাহাড়ের ঢাল, মাঝে কালো বালির উপত্যকা। সামনে হামতা পাসে ওঠার পথ, পুরোটাই সাদা তুষারে মোড়া। দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মাউন্ট ইন্দ্রাসন। ছবি তুলেছেন শুভঙ্কর ঘোষ।



সভ্যতার আশীর্বাদ

হঠাৎ দেখে কি মনে হচ্ছে কোনও আর্ট গ্যালারির দৃশ্য? এ আসলে নিউ ইয়র্কের মেট্রো স্টেশনের ছবি। ব্যস্ত দিনেও উপচে পড়ছে না ভিড়। এমনই এক মুহূর্তের সাক্ষী রইলেন সুমনা চক্রবর্তী।

*এই বিভাগে ছবি পাঠান, ই মেল: **sananda@abp.in***





নিজের সঙ্গে একান্তে সময়যাপন। মিড লেংথ পার্পল এ-লাইন ড্রেসের সঙ্গে শিয়ার জ্যাকেট। পারফেক্ট ফর পেনসিভ মুড।

পোশাক: আদ্যা
ফোন: ৭০৪৪২৮৫৬৫৬

নিজেই নিজের SOUL-MATE

নিজের শর্তে জীবন বাঁচার আনন্দই আলাদা। জীবনের মূলমন্ত্রই হোক নিজেকে উদযাপন করা! আর সেই উদযাপন করতে গিয়ে কখনও একটু নিয়ম ভাঙতে পারেন, কখনও বা স্রেফ নিজের মতো করে নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন। পুরোটাই আপনার মর্জি...



রঙিন উজ্জ্বল পোশাক পরলে নাকি মনও ভাল থাকে। ডার্ক পার্পল ধোতি প্যান্টস ও টপের কো-অর্ড সেট। কালার থেরাপি যেন...

পোশাক: সাস্যা



চেহারার গড়ন যেমনই হোক না কেন, পছন্দসই সাজতে বাধা নেই। সলিড কালার্ড ড্রেপড আউটফিটের সঙ্গে টিম আপ করা হয়েছে এমব্রয়ডার্ড জ্যাকেট। স্মার্ট লুক।

পোশাক: সাস্যা, শেক্সপিয়র সরণি
ফোন: ০৩৩২২৮৯২৩২৩



সোলো ডেটে গিয়েছেন কখনও? না গেলে এবার যান। নীলের দুরকম শেড মিলিয়ে ড্রেপড আউটফিট। সঙ্গে টপ বানে পারফেক্ট লুক।

পোশাক: আদ্যা



BFF

নিজেই নিজের
বেস্ট ফ্রেন্ড। সত্যিই
তো, এমন বিশ্বস্ত
কমপ্যানিয়ন কী
আর হয়! প্রিন্টেড
রেড জাম্পসুট
আর মিনিম্যাল
জুয়েলরির সাজ।

পোশাক: সাস্যা





মাঝে মাঝে একটু রিল্যাক্স করাও জরুরি। ওই যাকে বলে, আর্ট অফ ডুয়িং নাথিং। মিড লেংথ পেস্তা রঙা কটন ট্রাউজ়ার্স, হলুদ সামার জ্যাকেট আর বই...

পোশাক: অরণ্য
ফোন: ০৩৩২৪২৩৬০১১



প্যাম্পার ইয়োরসেল্ফ। পরনে প্রিন্টেড অফ হোয়াইট জাম্পসুট। হেডব্যান্ডে ফ্লোরাল টাচ। ডে আউটের জন্য আদর্শ।

পোশাক: আদ্যা

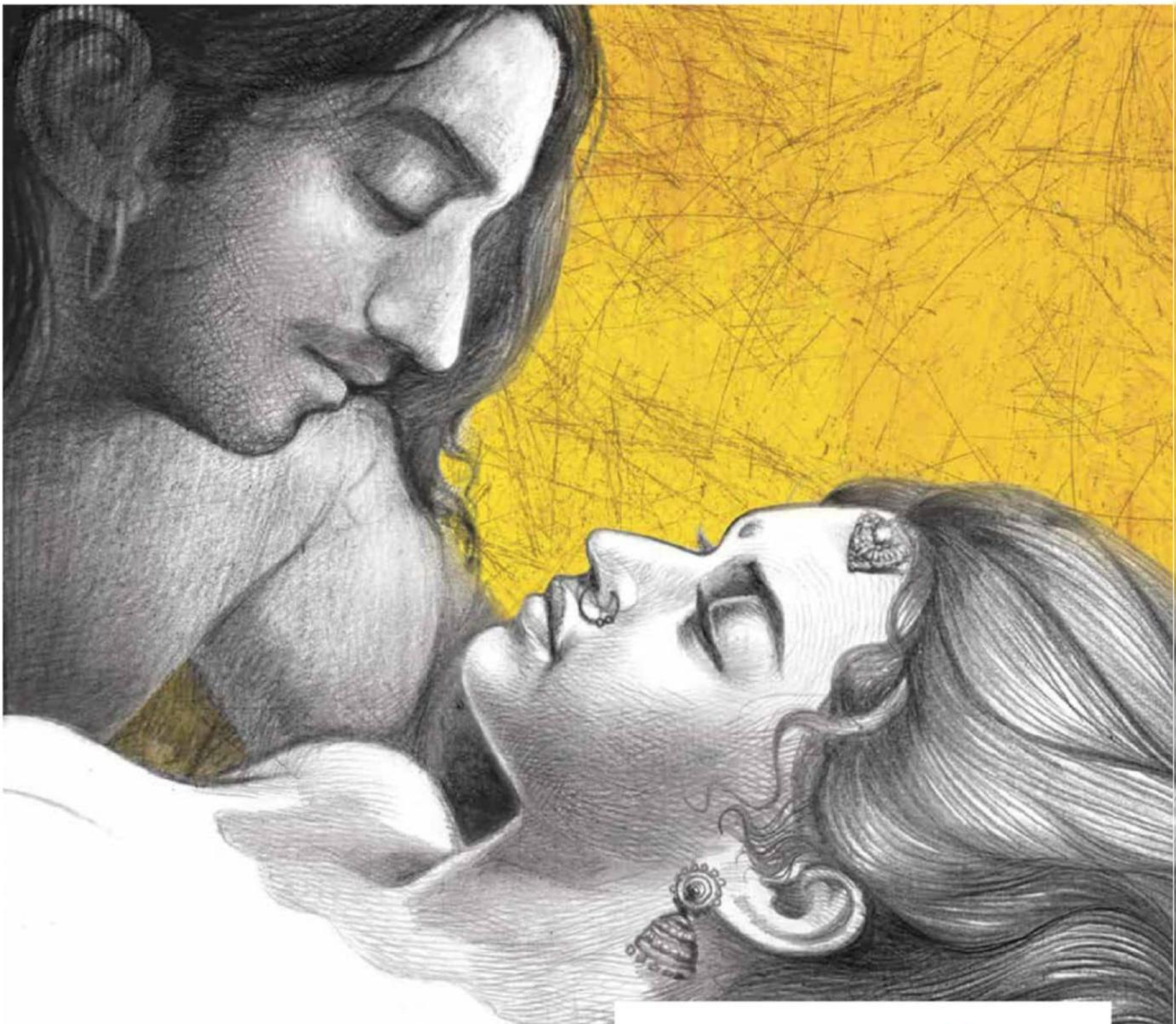


বাটারফ্লাই প্রিন্টেড
অ্যাসিমেট্রিক্যাল
ড্রেস। পোশাকের
মতোই মনেও
খুশির ছোঁয়া।

পোশাক: অরণ্য

মডেল: শুভমিতা,
তনুশ্রী, অনসূয়া
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
রুপোর গয়না:
করিশ্মাজ়, গোলপার্ক
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯৯০০
ছবি: শুভদীপ ধর
পরিকল্পনা ও রূপায়ণ:
মৌমিতা সরকার,
মধুরিমা সিংহ রায়

ফ্যাশন শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি



শ্রীমতী

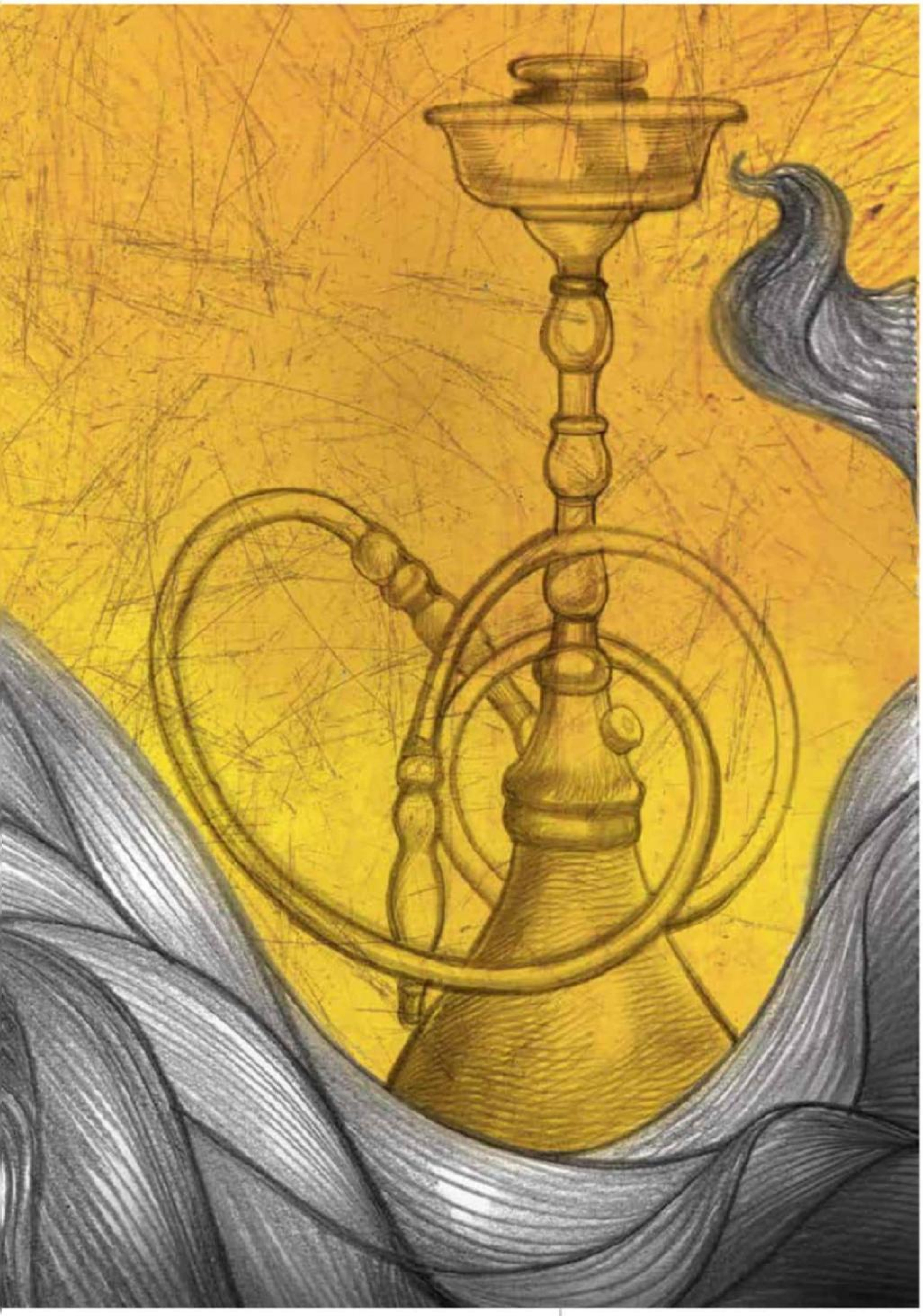
তাপস রায়

আগের ঘটনা

শ্রীমতীর কাছে দাদু নন্দকুমারের সূত্রে পাওয়া টাকার বড় অংশ পাঠিয়ে দিলেন মহানন্দ রায়। কিন্তু শ্রীমতীর মনে ভয়, নিধুবাবু যেন মহানন্দের মুখোমুখি না পড়েন। মানুষ হিসেবে তিনি ভারী সজ্জন। শ্রীমতী তাই দাসীর হাতে চিঠি পাঠাল নিধুবাবু যেন কিছুদিন না আসেন তার বাড়ি। কিন্তু মহানন্দই শ্রীমতীকে গান শুনিয়ে মোহিত করতে শিষ্য মোহনচাঁদসহ নিধুবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শ্রীমতীর বাড়ি। তারপর...।

{৩}

অবশ্য গতরাতে রাজা মহানন্দকেও চমকে দিয়েছে শ্রীমতী। অনেক অনেক দিন হল কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা অক্ষতযোনী এই শ্রীমতীকে তিনি রক্ষিতা হিসেবে নতুন জীবন দিয়েছেন। তা প্রায় বছর বারো হয়েছে। কিন্তু এমন করে শরীর মেলে ধরতে কখনও দেখেননি মহানন্দ।



এমনিতেই শ্রীমতী সুরসুন্দরীদেরও ঈর্ষার কারণ হতে পারে, এমন রূপ। আর এখন তো ছাব্বিশ বছর বয়সে যৌবন, দিঘি ভর্তি জলের মতো টইটম্বুর।
গয়না আর টাকা আগে পাঠিয়ে দিলেও মহানন্দ রায় নিজে খালি হাতে আসেননি। তিনি এ বাড়ির দাসী, মাসি, আর শ্রীমতীর জন্য শাড়ি নিয়ে এসেছেন। নতুন সেই কুঞ্জফুল শাড়িতে আর গহনার সেটে ঘর ঝলমল করে উঠেছে। নববধূটির মতো লাগছে। পায়ের নূপুর ঝমঝম করে বাজছে। হাতের বাউটি চুড়ি বাজছে। নাকের নথ ঝুলে এসে বাজছে। গলায় একসঙ্গে অনেকগুলি হার। আজ সুর্মা টেনে আরও ভাসিয়ে দিয়েছে আঁখি। পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল করে রেখেছে। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না।
রাত্রি এক প্রহর কেটে গেছে অনেকক্ষণ। মহানন্দ রাতের বেলায় আহারের পর একটু আফিমের নেশা করেন। তিনি পালঙ্কের উপর বুঁদ হয়ে বসেছিলেন। হাতে ফরসির নল ধরা। তাতে টান দিচ্ছিলেন কি দিচ্ছিলেন না, ঠাহর হয় না। শ্রীমতী ঘরে ঢুকতেই মহানন্দ চোখ বড় করে চাইলেন।
"বলুন তো রাজামশাই, আমাকে কেমন দেখতে লাগছে? সুন্দরী বললে হবে না। সে আমি জানি। আপনি পণ্ডিত মানুষ। সঙ্গীত চর্চা করেন, বড় বড় বই পড়েছেন, আজকে আমার রূপের প্রকাশ কেমন, তা একটা জুতসই কথায় আপনাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, হ্যাঁ," বায়না ধরা কিশোরী মেয়ের মতো কণ্ঠস্বর শ্রীমতীর।

২৫

হাতের ফরসির নল বিছানার উপর নামিয়ে রাখলেন মহানন্দ রায়, "তুমি দামাস্কাসের গোলাপ। তুমি বেহেস্তের হুরি। তুমি বাঙালি মেম। রাজা নবকৃষ্ণের বাগানের শ্বেতপাথরের মর্মর পরি। তুমি কিন্নরী, বিলিতি ভেনাস। তুমি স্বপ্নসুন্দরী।"
"ও বাবা! থাক থাক। রূপের বর্ণনা দিতে দিতে তো রাত ফুরিয়ে ফেলবেন," শ্রীমতীর সমস্ত শরীরে আমন্ত্রণ ঢেউ মেলেছে। মহানন্দের পাশ থেকে ফরসির লম্বা নলটি সরিয়ে সে পালঙ্কে উঠে বসল তাঁর গায়ের কাছটিতে। তার পর তাঁর কোলের উপর শরীরের অর্ধেক তুলে দিয়ে বলল, "বলতে পারলেন না, আমি আপনার হৃদয়ের সাতনরি হার, চোখের মণি! কেবলই বইয়ে পড়া কথায় আমাকে তুষ্ট করেন!"
শ্রীমতীর কণ্ঠে অভিমান। রাজা মহানন্দের আফিংয়ের নেশা কেটে গেছে। শ্রীমতী কোলের উপর শুয়ে মহানন্দের একটা হাত নিয়ে খেলতে খেলতে নিজের আধখোলা সুডৌল অঙ্গের উপর চেপে ধরেছে। মহানন্দর চোখ চলে যেতে দেখলেন, সেখানে জ্যোৎস্নার প্লাবন।
আতর গোলাপ লাগিয়ে এসেছে শ্রীমতী। ঘরে একদম দিব্য পরিবেশ। কুঞ্জফুল শাড়ি এমন মসৃণ যে, শ্রীমতীর শরীরের লোমাদিও দৃশ্যমান। রাজার নজরে পড়েছে শ্রীমতীর নিম্নাঙ্গের লোমহীন অবয়ব। এর আগে কখনও সেভাবে তিনি দেখেননি এসব। শ্রীমতী বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ঘরের দোর লাগিয়ে এসে বলল, "রাজা, আজ আপনি আপনার নিজস্ব ধনকে নিজের হাতে উন্মোচিত করে দেখুন। নিজের অঙ্গের মতো ভেবে নিজেই আমার শরীরের বস্ত্র, বেশভূষণ, অপসারণ করে নিখাদ আমার রূপ-প্রতিমা দেখুন। আজ এই শরীরের সমস্ত রঙ্গস্থান আপনার হাতের ছোঁয়ায় পুলকিত হোক।"
মহানন্দ শ্রীমতীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কাঁপা হাতে খানিক গহনা, আর শাড়ির আঁচল সরিয়ে দিতে পারলেও পুরোটা পারলেন না। শ্রীমতীর বুকে ফুল তোলা কাঁচুলি এমন টাইট হয়ে ধরে রেখেছে তার উত্তুঙ্গ বক্ষ দু'টি,

গিঁট খুলতে পারলেন না। খুলতে অপারগ হয়ে তিনি যখন খানিকটা হাঁপাচ্ছেন, শ্রীমতী নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাভরণ আর নিরাবরণ করে নিল। আর উল্টোদিকে রাজা মহানন্দের জলেশ্বরের ধোলাই করা ফিনফিনে ধুতি সে এক টানে খুলে নিয়েছে। মহানন্দ বলে রেখেছিলেন। সেই হেতু সারা দিন ধরে আয়োজনও করেছে আজ শ্রীমতী। মহানন্দ নিজেই জোড়াসাঁকো থেকে কয়েকজন বাজনদার নিয়ে এসেছেন। এরা ঢোল আর বেহালা বাদনে বিশেষ পারদর্শী। প্রত্যেককেই দশ টাকা করে দিয়েছেন। ঝাড়বাতির আলোয় বৈঠকখানার প্রতিটি কোণ উজ্জ্বল। ঘরে আতর জল ছেটানো হয়েছে। তাকিয়ার পেছনে আজ একটি ফরসি বেড়েছে। কে জানে নতুন আগন্তুক তামুক খায় কি না! কিন্তু ব্যবস্থা তো রাখতে হবে। লাল জরির পোশাকে ঝলমল করতে থাকা মোহনচাঁদের দিকে নজর পড়তেই শ্রীমতী কেঁপে উঠল। মোহনচাঁদ শ্রীমতীর চোখে চোখ রেখে কেমন যেন একটা শিরশিরে বোধে মাথা নামিয়ে নেয়। গুরুদেব পাশে বসে আছেন। শ্রীমতী দেখল, রামনিধির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ঝুলে পড়েছে। শ্রীমতী বুঝতে পারে সেই হাসির মানে। খানিকটা ব্যঙ্গ যে সেখানে, তা ধরতে পারে। শ্রীমতী জানে, রামনিধি তার চিঠির প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। সে চিঠিতে রাজা মহানন্দের উপস্থিতিতে এখানে আসা তাঁর বারণ ছিল। শ্রীমতী দেখে, সেই মহানন্দই তাঁকে এখানে ধরে আনল।

লাল মদ, শুকনো খেজুর, আর কাজুবাদামের থালা সামনে। একটু মদে চুমুক দেওয়ার পর মহানন্দ বললেন, "বাংলা গীত-বাদ্য জগতের সম্রাট রামনিধিবাবুকে তো আর আমি গান গাইতে বলতে পারিনে। কিন্তু শ্রীমতী, আজ এখানে যিনি নতুন এসেছেন সেই মোহনচাঁদের গলা শুনে বুঝতে পারবে, এই স্বর এই মাটির নয়, এ স্বর দেবলোকের।" আজ শ্রীমতীকে একটা গান শোনাতে ইচ্ছে করছিল রামনিধির। তিনি এই গানে শ্রীমতীকে যা উত্তর দেওয়ার দেবেন। কিন্তু সত্যি-সত্যি মোহনচাঁদ যদি গান ধরে, রামনিধির গানে আর মনোযোগ দেবে না কেউ। ফলে নিজে থেকেই আজ একটা গান ধরে ফেললেন। বললেন, "রাজামশাই একেবারে যথার্থ বলেছেন। এই বালকটি খুবই প্রতিভাধর। আমার আখড়ার প্রধান সম্পদ। আখড়াই গানের উপর এর যা দখল, অন্য কারও সেরকম দেখিনে।"

এর পর রাজা মহানন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি এই গুণী মানুষের বশ হয়েছি। এঁর অভিপ্রায় বজায় রাখতে আমি প্রথমে একটুকু গাইব। তার পর গাইবে মোহনচাঁদ। আজকাল আমি সাধারণত আখড়াই গান আর গাই না। কিন্তু বাবু মোহনচাঁদের সঙ্গে এসেছি, একটুকু গাইব। আমি ভবানী আর প্রভাতী গাইব না। মাঝখানের খেউড় গাইব। বাকি দুটো অংশ মোহনচাঁদ গাইবে।"

এ তো না চাইতেই জল। রাজা মহানন্দ হর্ষধ্বনি করলেন। আগের দিন রামনিধিকে এখানে ধরে এনে গান গাওয়াতে পারেননি। এটা তাঁর মনের ভেতর একটা খচখচানি রেখে দিয়েছে। আজ শ্রীমতীর বাটিতে রামনিধির এক খানা গাওনা হলে তাঁর আশা মেটে।



মহানন্দ নিজেই জোড়াসাঁকো থেকে কয়েকজন বাজনদার নিয়ে এসেছেন। এরা ঢোল আর বেহালা বাদনে বিশেষ পারদর্শী। প্রত্যেককেই দশ টাকা করে দিয়েছেন। ঘরে আতর জল ছেটানো হয়েছে।

রামনিধি দেখলেন ঢুলি তাল তুলছে। চিনতে পারলেন। এ তো জোড়াসাঁকোর ন্যাটা বলাইয়ের চেলা নবু আঢ্য। এর হাতও গুরুর মতো জম্পেশ। গানের মাঝখানে যে সাজবাদ্যি হয়, তাতে যে হাতের কাজ চলে, লোকে গান না শুনেও শুধু বাজনা শুনে রাত কাটিয়ে দিতে পারে। রামনিধি দেখলেন, ঢোলে 'পিড়েবন্দি' তাল সে ঠুকছে।

২৬

রামনিধি ধরলেন গান। রামনিধি জানেন, পঙ্‌ক্তির শেষে মোহনচাঁদ 'দেওরা ওরে' বলে সুর বইয়ে দেবে। রামনিধি ধরলেন:

"পিরীতি করিলে হয় এই কী করি
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় হেরিতে॥

চাঁদের পিরিতি দেখ কুমুদী সহিতে।
বিধু আসি দেয় দেখা না পারে রহিতে॥"

আখড়াই গানের যেমন চলন মতে চিতেন, মহড়া আর পারঙ্গ দিয়ে খেউড় অংশ শেষ করলেন রামনিধি। শুধু মহানন্দ নয়, জলসায় সকলেই আহা আহা ধ্বনি তুলেছে। শ্রীমতী, তার মাসি তো গলে জল। দু'জনেই জুল জুল করে দেখছে এই মানী লোকটিকে। শ্রীমতী আগে টপ্পা শুনেছে, কিন্তু আখড়াই শোনেনি। আজ সে আবার বশ হয়ে গেল রামনিধির। তার এই বাড়ি ধন্য হল।

যারা বাজাচ্ছিল, তারাও খুশি। হালসির বাগানের পেশাদারি আখড়াই দল থেকে পার্বতীচরণ বসুকে আনিয়েছিলেন রাজা মহানন্দ রায়। তিনি নামী বেহালাবাদক। নবু আঢ্য, পার্বতীচরণ বসুরা খুশি, তাদের স্বপ্নপূরণ হয়েছে। রামনিধি গুপ্তর সঙ্গে তারা বাজাতে পেরেছে।

রাতের আহার এসে গিয়েছিল। লুচি, মাংস, রসগোল্লা খেয়ে এবার মোহনচাঁদের গান গাওয়ার পালা। সে এবার প্রধান। মোহনচাঁদ গুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কর্তা, আমি অন্য একটা গান ধরছি। আমাদের আটচালার গান। পক্ষীগীত। এঁরা তেমন কেউ শোনেননি। এঁদের শোনাতে খুব ইচ্ছে করছে। আমি মাছরাঙা পক্ষীর গান গাই।"

রামনিধি মোহনচাঁদ অন্ত প্রাণ। এই ছেলেটির প্রতিভার পরিচয় তো কয়েকবছর আগেই পেয়েছেন। তখন সে জিল দিত। তার পর আস্তে-আস্তে দোহার হল। এখন তো সে মহাগায়ক। বটতলার আটচালার সবাই জানে, মোহনচাঁদ পক্ষীচূড়ামণিকে একেবারে বশ করে ফেলেছে। রামনিধি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

কিন্নরপুরুষ মোহনচাঁদ। শ্রীমতী দেখছে জাদুকণ্ঠ গলে গলে সোনা হয়ে ঝরে পড়ছে এই ঘরে। এ কী ঘোর, এ কী ঘোর! মোহনচাঁদের সৌন্দর্যের ভেতর মেয়েলি রূপ যেন প্রবল। আর ওই মধু ঝরা গলাও বিবশ করে রেখেছে এই জলসাঘর। মোহনচাঁদ গাইছে :

"মিছে কিনেছি বদনাম।
সবাই গেল সাধু হয়ে পড়ে রইনু হাম॥
এ কাজ করে সব শালা,
কারও হয়নিকো জ্বালা,
প্রেমের ঘোরে অন্ধকারে হলেম বেতালা॥
ফেললি একা, ব্যাধের করে
বিধি! তোকে দিই সেলাম॥"

ভোরের আবছা আলো ফুটেছে। সবাই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। এমনকি, মাসি আর দাসীও নিধুবাবুর জন্য কিছু উপহারের ব্যাগ-সহ নীচে নেমেছে। মহানন্দ রায় আগে

থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি রামনিধিকে সঙ্গে নিয়ে নামছেন। সবার পেছনে পড়ে রয়েছে মোহনচাঁদ। সে নিজেই একটু বিলম্ব করছিল। আর ফিরে ফিরে দেখছিল শ্রীমতীকে। জলসাঘরের দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগের মুহূর্তেই শ্রীমতী পা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মোহনচাঁদ এমনিতেই নরম হয়ে ছিল। আজ একটু বেশি মদ খাওয়া হয়েছে। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে। তার মনে হল পায়ে ধুতি পেঁচিয়ে গেছে। সে হুড়মুড় করে উপুড় হয়ে পড়ল। শ্রীমতী ছুটে আসতে আসতে বলল,

"আহা, লাগেনি তো! এই জায়গাটায় আলো একটু কম আছে," বলতে বলতে শ্রীমতী মোহনচাঁদকে টেনে তুলে ধরে। দেখে, তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শ্রীমতী ঘাবড়ায় না। সে এক ঘটি জল নিয়ে আসে। তার পর মোহনচাঁদকে নিজের কোলের উপর শুইয়ে জলে আঁচল ভিজিয়ে নাকের উপর চেপে ধরে। সে জানে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রীমতী বেশি সময় নেয় না। মোহনচাঁদের খোঁজে কেউ না কেউ উপরে উঠে আসতে পারে। পালকিতে রামনিধির সঙ্গে মোহনচাঁদেরও ফেরার কথা। শ্রীমতী খুব তাড়াতাড়ি মনের কথাটি পেশ করে ফেলে। "ঘাবড়াবেন না। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উঠুন। আর হ্যাঁ, আপনার যখন মন চাইবে, এই বাটীতে চলে আসবেন। আপনার জন্য আমি সব সময় অপেক্ষা করে থাকব।"

রামনিধির মনে হয়েছে অনেকদিন তো পক্ষীকুলের সঙ্গে আছেন। সেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া জীবন। সকালে উঠে কুস্তি। তার পর গঙ্গায় সাঁতার কাটা। তার পর বাড়িতে ইস্টদেবতার ধ্যান করা কিছুক্ষণ। দুপুরের আহার করেই বেরিয়ে পড়া। আটচালায়। সেখানে খানিক গাঁজারুদের সঙ্গে আড্ডা, কখনও দু'-একটা গান। তার পর নিয়ম করে শ্রীমতীর বাড়িতে একবার ঘুরে আসা। সেখানে এক পাত্র মদ খেয়ে গান যদি বেরোয় ভাল, না হলে ঘরে ফিরে আসা। জীবনটা কেমন যেন শ্যাওলা ধরে গেছে। কিছু একটা করতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। তিনি মনে মনে স্মরণ নিলেন গুরুদেব ভিখনরাম স্বামীজির। তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁর স্মরণে অনেক বিপদ থেকে রামনিধি উদ্ধার পেয়েছেন।

২৭

রামনিধি যখন প্রথম স্ত্রী আর সন্তানকে হারালেন, বড়ই পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকেও খুব দ্রুত হারানোর পর রামনিধি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে কালেক্টরেটের কাজের চাপ, অন্য দিকে মুসলিম উস্তাদের খারাপ ব্যবহার। তিনি কিছুতেই শোরি মিঞার টপ্পা ভাল করে শেখাচ্ছেন না। রামনিধি ভেঙে পড়ছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। তখন ছাপরার রতনপুরার সন্ন্যাসী ভিখনরাম তাঁকে উদ্ধার করেন। আজ তিনি বুঝতে পারেন, তখন রাগের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিলে আজ এত নিশ্চিন্তে গানবাজনা করতে পারতেন না। অন্নসংস্থানের জন্যই ছুটে বেড়াতে হত। চাকরি শেষে যে দশ হাজার টাকা অবসরের সুবিধে হিসেবে পেয়েছিলেন, সেটাই তো এখানে মার্কিন জাহাজি কোম্পানির মুতসুদ্দি রামচন্দ্র মিত্রের হাত ধরে নুনের এজেন্টদের কাছে আর সোড়ার ব্যবসায় খাটছে। আজ তাই সংসার চালানোর চিন্তা নেই।

রামনিধিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল দেওয়ান জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, কালেক্টরেটে কাজ করবে আর ঘুষ খাবে না! খাও খাও। কিন্তু রামনিধি জানতেন, জগন্মোহনের পরামর্শে একবার যদি ঘুষ খেতেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের কাছে গিয়ে বলে তাঁকে জেলে পুরে দেওয়ার ব্যবস্থা করত জগন্মোহন। রামনিধি প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রতিবাদীকে পায়ে পায়ে কাঁটার খোঁচা সহ্য করতে হয়। ছাপরায় দীর্ঘ সময় সেই নির্যাতন সহ্য করেছেন। কালোয়াতি গানের পাঠ নিতে নিতে রামনিধি নিজের মনোজগতে শক্তিশালী হচ্ছিলেন।

আজ স্নানের ঘাটে এসে জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে লক্ষ করছিলেন, একটি বালক ভেসে যাচ্ছে সকালের জোয়ারে। কিন্তু সে সাঁতার জানে। ফিরে আসছে ডাঙার দিকে। পারছে না, আবার ভেসে যাচ্ছে। রামনিধি এই প্রৌঢ় বয়সেও সাঁতার জানেন আর তাঁর যা দম, অনায়াসেই তাকে তুলে আনতে পারেন। কিন্তু রামনিধি চাইছেন ওই বালকের লড়াই। একবার জিতে গেলে ওর বুকে এমন সাহস হবে, যা তার জীবন গড়ে দেবে। ছেলেটো মিনিট দশেকের চেষ্টায় ঘাটে উঠে আসতে পারল। রামনিধি খুশি হলেন। নিজে জলে নামার আগে ভাবলেন, আবার একটা চেষ্টা করতে হবে। নতুন কিছু। শোভাবাজারের রাজারা চাইছেন রামনিধি যেন নতুন কিছু একটা করে। জলে নামার আগে এক অঞ্জলি জল মাথায় নিতেই ঝিলিক মেরে উঠল। হ্যাঁ, এটা তো করা যায়। নতুন বাংলা গানকে জনপ্রিয় করতে যদি গানের লড়াই করা যায় দু'দল বা তিন দলের, তা হলে যেমন নতুন নতুন গান তৈরি হবে, তেমনই নতুন কণ্ঠ-শিল্পী, বাদ্য-শিল্পীদেরও সমর্থন জোগানো যাবে। মনে করেছেন, আজ আটচালায় যাওয়ার আগে একবার বাগবাজারে বন্ধু রসিকচাঁদের বাড়ি ঘুরে যাবেন। তাঁর কী মত, জেনে নেবেন। হালসির বাগানে যেসব গীতযুদ্ধ হয়, তাকে যদি একটা বড় আকার দেওয়া যায়! আলোচনা করবেন বন্ধুর সঙ্গে। পেশাদার আখড়াই দলের বৈষ্ণব দাস যে 'আড়াতাল' ভেঙে নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন, মানে ওই 'পিড়েবন্দি', 'দোলন', 'দৌড়', 'সবদৌড়', তা জনগণকে বেশ আকর্ষণ করছে। তা হলে যদি আখড়াই গানের একটা দল করা যায়, কেমন হয়!

২৮

বাগবাজারের বন্ধু রসিকচাঁদ গোস্বামী কলকে লাগানো লখনউ-এর চিলম হুঁকোটি রামনিধির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি কচ্ছ, মানে তা দাঁড়ায়ে যাবে। আরে, তুমি হলোগে বাংলার শোরি মিঞা। তোমার নামে এমনি এমনিই জয়ধ্বনি ওঠে!"

"কিন্তু রসিক, দল বানাতে গেলে তো মেলা ঝামেলা। এই বয়সে, আমি কি আর পারব!"

"খুব পারবে। তোমার নাম থাকলেই সব দিব্য দাঁড়িয়ে যাবে।"

"কিন্তু দ্যাখো, এর জন্য গানবাজনার জায়গা চাই, তামুক-টামুক আধারের খরচ চাই। দলের গাইয়ে, বাজিয়েদের একসঙ্গে ধরে ফেলা চাই। এত গুছিয়ে তোলার কাজ কি আমার পক্ষে সম্ভব!"

"আহা, এসব ছোটখাটো বিষয়ে তুমি মাথা দিচ্ছ কেন! মোহনচাঁদ আর আমি সেসব সামলে নেব। তুমি নতুন আখড়াই গানের সুর দাও দিকি, আর প্লান ভাঁজো। তুমি এ-ও জানবে, বাগবাজারের দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আছেন। তোমার নামে তিনি উদারহস্ত। আমি তারে কবোখানে। খরচাপাতি তিনি চালিয়ে নেবেন। আর শোনো ভায়া, আমার বাটী যদি তোমার পছন্দ হয়, তুমি অনায়াসে এখানে গানের দলের মহড়া দিতে পারো।"

"একটা কথা তোমায় বলি রসিক, এখন সময় পাল্টে গেছে। শান্তিপুরের খেউড় দিয়ে নতুন বড়লোকদের মন জয় করা যাবে না। এঁরা সব শিক্ষিত। ওই গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষের মন জয় করার জন্য যে অশ্লীল গীত এতকাল গাওয়া হয়েছে, তা এই কলকাতার বাবুরা হয়তো নেবে না।"

"তা, তোমার হাতেই তো সব। গাওনার আগে সেই সব অশ্লীল শব্দ বাদ দিয়ে নতুন কথা বসিয়ে দাও। ব্যস, চুকে গেল।"

“এ জন্যই তোমাকে এত ভরসা করি রসিক। তোমার বাজনার হাতটি যেমন খোলা, মনও। আমার মনের ভেতরে জমা সংশয় তুমি তো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে ভায়া।”
রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বললেন, “খুব উত্তম প্রস্তাব। তা শিবে, তুমি আবার শোভাবাজারের জলসাঘর ঝলমল করে দাও তো দেখি! আর এবার রামনিধিকে বোলো, ও যেন নিজে এসে গানবাজনা করে। বাবা নবকৃষ্ণ তো রামনিধিকে কিছুতেই এই চৌহদ্দিতে ঢোকাতে পারেননি।”
বাগবাজারের দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বললেন, “এখন রামনিধির তেজ পড়তির দিকে। বটতলার আটচালায় সপ্তাহে দু’-এক দিন যায়। যখন টপ্পা লহরির আসর থাকে। না হলে আর পক্ষীদলের রাজা সাজার জন্য তেমন নিয়ম করে সেখানে বসে না। বদলে এখন ওকে বাগবাজারের খোপে ভরে ফেলেছি। আমার এক চেলা আছে— রসিকচাঁদ। ওর বাড়িতেই আখড়াই-এর কায়দাকানুন ভাঁজা চলছে।”
“তাই নাকি! তা হলে এক কাজ করো, আমার বটতলার ছেলেপিলেগুলোকেও রামনিধি যেন কাজে লাগান। জানো তো, বলং বলং বাহু বলং। আমি এখান থেকে হাঁক দিলে বটতলা আগে শুনতে পাবে। বাগবাজার পরে। তুমি ওকে বলো রামনিধি যেন দুটো দল গড়ে। আর দল তৈরি হলে যেন আমাকে জানায়। গোটা রাত দু’দল লড়াই করবে। যে দল জিতবে তাদের জন্য প্রচুর পুরস্কার।”

২৯

রসিকচাঁদের কাছে খবর চলে এসেছে। রাজাবাহাদুর রাজকৃষ্ণ দেব চান, তাঁর নাটমণ্ডপে রামনিধি স্বয়ং এসে যেন গান করেন। রসিকচাঁদ বলল, “নিধু, তোমাকে কিন্তু আমাদের বাগবাজারের দলে থাকতে হবে। এটা আমার আবদার। আমি বাগবাজারের লোক, কোন মুখে শোভাবাজারের দলে ভিড়ি বলো! আর তা মানবেন না বাগবাজারের দেওয়ান শিবচন্দ্র।”
“বেশ, তালে তোমার বাগবাজারের দলে থাকুক জোড়াসাঁকোর রামলোচন বসাক। আমি বটতলায় শোভাবাজারের দলে।”
“অসম্ভব। আমি রামনিধি ছাড়া অন্য কারও দলে গিয়ে খোলে চাঁটি বসাতে পারব না। আর শোনো হে রামনিধি, মোহনচাঁদ, তোমার ভাণ্ডার, সে-ও এই বাগবাজারের পোলা। ও কেন যাবে শোভাবাজারের দলে!”
রসিকচাঁদ মোক্ষম জায়গায় আঘাত করেছে। মোহনচাঁদ রামনিধির দুর্বলতম জায়গা। রামনিধির দুই ছেলে জয়গোপাল আর সুখময়ের চেয়েও যেন বেশি স্নেহ করেন মোহনচাঁদকে। এই মোহনচাঁদকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মানে রামনিধির প্রাণ হরণ। রামনিধি বললেন, “অত লাঠালাঠির দরকার নেই। বাগবাজার আর শোভাবাজার একত্রেই একটি দল হবে। তোমরা সবাই আমার দলে থাকবে। আর দু’নম্বর দলটি হবে পাথুরিয়াঘাটার নীলমণি মল্লিকের নেতৃত্বে। সেও আমার বিশেষ বন্ধু। ওদের দলে আছে আমার মামা কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র গোকুলচন্দ্র সেন আর বিখ্যাত শ্রীদাম দাস।”
রসিকচাঁদ যুদ্ধ জেতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, “নীলমণির দলে যেই থাকুক না কেন, আমাদের দলে আছে মণিকাঞ্চনের নিবিড় যোগ। পারবে কেন!”
“মানেটা কী হে ভায়া?”
“তেমন মানে নেই রামনিধি। মোহনচাঁদ আর রামনিধি যে দলে, তারে রোখে কে! সব পুরস্কার আমাদের।”
রামনিধি বললেন, “তুমি কি কম রসিক! তোমার ঢোল তো শুধু কথা বলে না, গাওনাদারদের দৌড় করায়। তোমার মতো ঢোলের হাত বাংলায় আর কার আছে! আমার খুব বিশ্বাস, তুমি যদি গানের আসর ছাড়া শুধু বাদ্যযন্ত্রের আসর করো, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে সারা রাত কাটিয়ে দেবে।”
“ছাড়ো ওসব লঘু কথা। তুমি কিন্তু নিজের মুখে তারে বোলো।”



রামনিধি বললেন, “তুমি কি কম রসিক! তোমার ঢোল তো শুধু কথা বলে না, গাওনাদারদের দৌড় করায়। তোমার মতো ঢোলের হাত বাংলায় আর কার আছে!”

“কারে বলব?”
“কারে আর! এই বাগবাজারে কে আর আছে অমন বেহালা বাজায়! আমার সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই। কিন্তু শুনেছি সে পেশাদারি দলে বেহালা বাজিয়ে খুব নাম করেছে। দল বানাতে হলে একদম সেরাটাই বেছে নিতে হবে। আমি জানি তুমি, মানে রামনিধি বললে সে না করতে পারবে না।”
“আরে, তখন থেকে সে, তারে, এসব বলে কথা বাড়িয়েই যাচ্ছ। কিন্তু নামটা বলছ না। আমি কি মন্ত্রতন্ত্র জানি নাকি!”
“তাই তো নাম বলিনি না! তিনি এতই খ্যাতনামা যে, নামের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি হলেন গে আমাদের বাবু রাধানাথ সরকার। তাঁর ছড়ের টান তো শুধু টান নয়, কানে মধু বৃষ্টি হওয়া।”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাঁর গুণপনা শুনেছি। বটতলার পক্ষীদের কোনও একজনের মামা। তুমি বলছ যখন, আমি সেই পক্ষীকে দিয়ে তাঁকে একদিন বটতলার আটচালায় ডেকে কথা বলে নেব। তিনি পেশাদারি হলে তাঁকে কিঞ্চিৎ অর্থদানেরও ব্যবস্থা করতে পারি। না হলে তো আবার সেই হালসির বাগানের পেশাদারি দলের দিকে তাঁর মন টানবে।”
চাকর রুইদাস নিঃশব্দে নতুন টিকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আগুন আবার ধিকিধিকি জ্বলে উঠছে। ভুভুক ভুভুক টানে আবার ধোঁয়া উঠছে। রামনিধি বুকের ভেতর আগুন পাচ্ছেন আবার। এই আগুনটাই নিভে ছিল এতদিন। ভেবে দেখলেন, এখানে বন্ধুর বাড়িতে আসার সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল। রামনিধি যখনই কোনও নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন, তা খুব একটা ভুল প্রমাণিত হয়নি। আজ রামনিধি প্রমাণ পেলেন, রসিকচাঁদ তাঁর খুব ভাল বন্ধু শুধু নয়, রামনিধিকে সে ভালও বাসে।

৩০

খানিকটা নতুন তামাকের মৌতাত নিয়ে রামনিধি বললেন, “কিন্তু আখড়াই দল তো তিন-চার জনে হয় না। এ তো আর টপ্পা নয় যে, আমি গাইলাম বা মোহনচাঁদ গেয়ে বাজিমাত করে দিল। কম করে দশ-বারো জন তো লাগবেই।”
রসিকচাঁদ বললেন, “এটা একটা কথা হল! তালে তুমি এতদিন বটতলায় বসে করলেটো কী! অ্যাঁ। সেই তো বিদেশ থেকে এসে ওখানে বসে গেছ! তা বছর দশেক তো হবে, না কি?”
“হ্যাঁ ছাপরার কালেক্টর অফিসের কাজ থেকে আমার ছুটি হয়েছে ওই ১৭৯৪ সালে। তা বছর দশেক হবে।”

"তা, এত দিন ধরে তোমার পক্ষীকুলকে কি শুধু আধার খাইয়েছ, গান-টান কিছু দান করোনি?"
"সে তো টপ্পা শিখিয়েছি। মেলা পক্ষী সে গান জানে। কিন্তু তা দিয়ে এই আখড়াই গানের কী হবে ভায়া?"
"হবে, হবে। মা'র পেট থেকে পড়েই কেউ দৌড়য় না। আমাদের সকলেরই তো মহড়ায় বসতে হবে, না কি! ওরাও বসবে। মাসখানেক অভ্যেস করলে একদম হাওয়ার বেগে ছুটবে দল। তুমি দ্যাখোই না, আমার গুরুদেব রামজয় সেন যখন বাজনা বাজাতে এসেছিলেন, তখন আখড়াইতে কেবল আড়া তাল। কিন্তু দ্যাখো, কালে কালে কত তাল এসে গেল— পিড়েবন্দি, দোলন, মোড়, দৌড়, সব-দৌড়।"
রসিকচাঁদের কাছে দেখা যাচ্ছে, সব অন্ধকারের জন্য আলোর ব্যবস্থা। তার কাছে কোনও 'না' ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারছে না। কিন্তু রামনিধির এখনও যেন কেমন পিছনে টান।
রসিকচাঁদ নিজেও মিষ্টি হেসে বললেন, "অত ভেবো না। সব হয়ে যাবে। আমি চুপি চুপি হালসির বাগানে গিয়ে দেখে আসব, ওই পেশাদাররা কে কী করে। সেই মতো দল বাঁধা হবে।"
রামনিধি ফরসির নল নামিয়ে রেখে বললেন, "তা হলে আজকের মতো উঠি ভায়া। একবার আটচালার দিকে যাই।"
"হ্যাঁ, জানি তো, সেখানে না গেলে তোমার পেটের ভাত হজম হবে না।"
রামনিধি হাসতে হাসতে বললেন, "ছেলেপিলেরা আমাকে খুবই ভালবাসে যে।"
শ্রীমতী শুনেই তো লাফিয়ে উঠেছে, "খুব ভাল হবে নিধুবাবু। তোমাকে এজন্যই আজ খুব চনমনে লাগছে।"
"হ্যাঁ, দলটা ফাইনাল করে তোমাকে খবর দিতে ছুটে এলাম। সত্যি-সত্যি মনে আবার গঙ্গার জোয়ার লেগেছে। আবার ছুটোছুটি, আবার নতুন কিছু। আবার রামনিধির নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ। না হলে তো সেই থোড়-বড়ি-খাড়া জীবন। কাঁহাতক সহ্য হয়!"

"ওঃ, শুধু আমাকে আখড়াই দলের খবর দিতে এয়েছ! আমাকে দেখতে আসোনি! মানে, আমার দর তোমার কাছে ফুরিয়েছে।" শ্রীমতী একটু ভান ধরল। গলায় কান্নার ভাব আনল। শাড়ি বুকের উপর ভাল করে টেনে মাথা নিচু করে বসে খানিকটা চুপ করে অভিমান দেখাল।

৩১

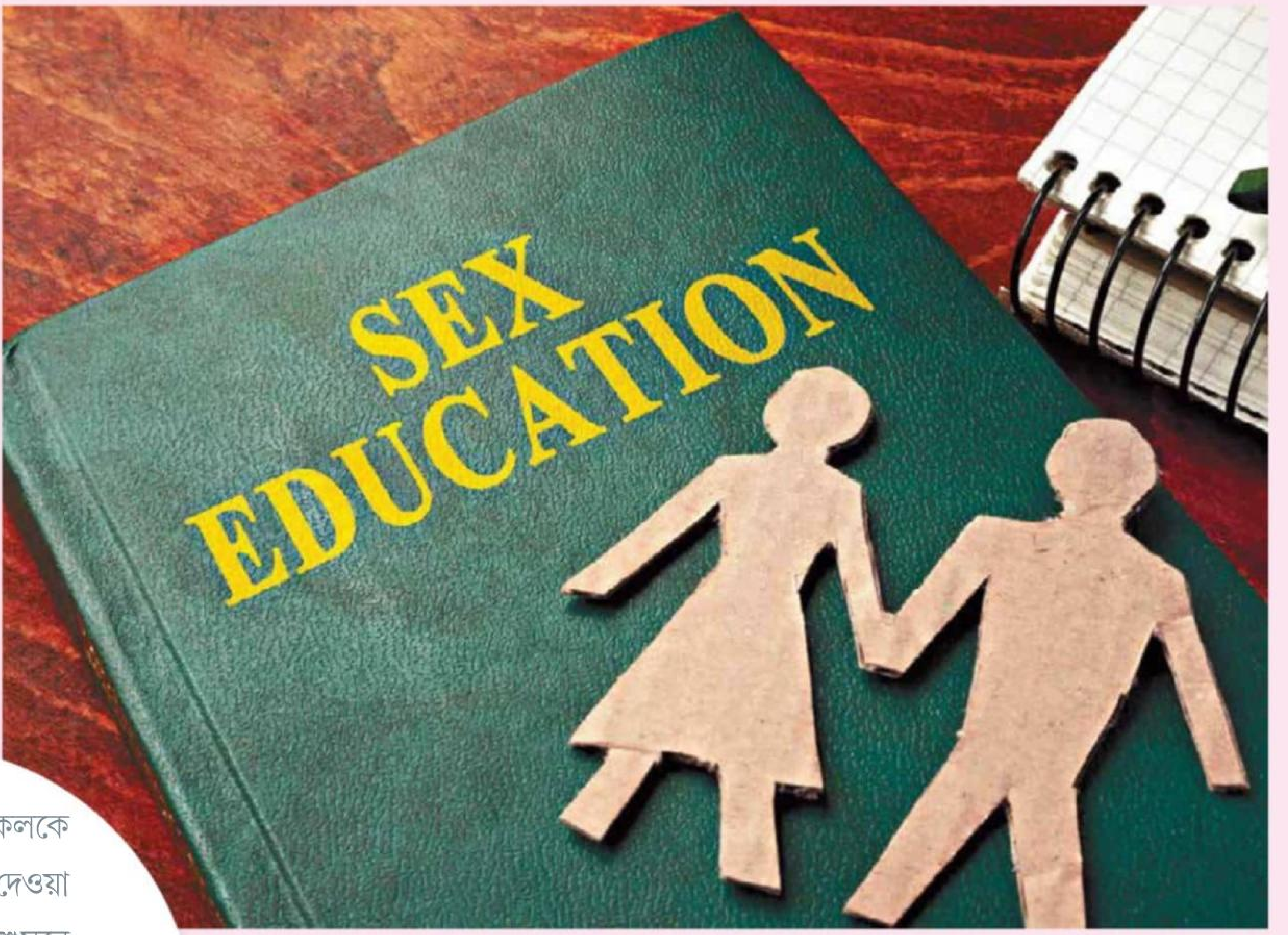
রামনিধি বললেন, "আমি তাই বলেছি নাকি! তুমি হলো গে আমার..."
"আমার কী? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বই তো কিছু নয়," শ্রীমতী ইচ্ছে করে একটু দূরত্বের আবহ তৈরি করতে চায়। মানে, সে বুঝতে পারছে, তার মনের ভেতরে মোহনচাঁদের জায়গা তৈরি করে রাখতে হবে। সেদিন নাক ভেঙে যাওয়ার পরও ওই ফিরে তাকানো। তা ছাড়া কোলের উপরে নিয়ে যখন ওই চাঁদের মতো মুখমণ্ডল ভেজা আঁচলের জলে পরিষ্কার করছিল, তখন সে ছেলে চোখ বুজেই মিটিমিটি হাসছিল। একেবারে দুষ্টু কেষ্ট যেন।
রামনিধি শ্রীমতীর অভিমান ভাঙাতে আর কথা ব্যয় করলেন না। বদলে একটা গান ধরলেন। মনের ভেতর কুলকুল করে যে গান আসছে একটা:

"কেমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
চক কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে।
প্রাণ বিনা শূন্যদেহ, থাকে কী প্রকারে।
শশী বিনা নিশি কোথা, বলো শোভা
করে॥"

শ্রীমতীর হাঁ করে শোনা ছাড়া কিছু করার ছিল না। রামনিধি যখন গান ধরেন, শ্রোতারা মুগ্ধতার বাইরে অন্য কিছুই করতে পারে না। যেন জাদু বিছিয়ে দেন সুরে। শ্রীমতী দেখল, রামনিধি গান গাওয়ার জন্য সময়ের নিরিখে যে তালের কথা বলেছেন, সেই সন্ধ্যার পরের তাল ঝিঁঝিটেই এই গান ধরেছেন। আর কী যে মায়া লাগিয়ে দিয়েছেন গানে! শ্রীমতীর মন আবার রামনিধির দিকে ঝুঁকে আসে, আবার তাঁর বুকে ঢুকে যেতে সাধ হয়। দাসী টিকের আগুন পালটে দিয়ে চলে গেছে। রামনিধি আবার মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের করছেন। সামনে মদের গ্লাস অর্ধেক হয়ে আছে। দাসী বেরিয়ে গেলে শ্রীমতী রামনিধির হাত থেকে ফরসির মাউথপিস প্রায় কেড়ে নিয়ে নীচে নামিয়ে রাখে। সামনের অর্ধেক শেষ করা পানপাত্রটিও বিছানা থেকে সরিয়ে দেয়। তার পর রামনিধির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
"বাবু, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"
রামনিধি এই আকস্মিকতায় খানিকটা বিহ্বল তো বটেই। তিনি পালঙ্কর উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন আর তাঁর বুকের উপর দাপাদাপি করছে এক সুন্দরী। এই দৃশ্য বোধে আনতেই বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। শ্রীমতীর প্রশ্নের উত্তর দেবেন কী, শ্রীমতীর এরকম ঝাঁপিয়ে পড়া আচরণ এর আগে কখনও তো দেখেননি। ঠিক উল্টোটাই হয়েছে। শ্রীমতী যখনই শরীর নিয়ে এসেছে রামনিধির কাছে, খুবই কুণ্ঠিত, লজ্জিত, শান্ত সেই ভাব।
রামনিধিকে উত্তর না দিতে দেখে শ্রীমতী তাঁর বুকের উপর থেকে নেমে পাশে আধ-শোয়া হয়ে রামনিধির একটা হাত টেনে নিজের নরম বুকের উপর চেপে ধরে বলল, "বাবু, তুমি রাগ কোরো না আমার কথায়। তোমার জায়গা আমার এই বুকের মাঝখানে। এখান থেকে কোথাও ওই আসন সরে যাবে না। এদিক-ওদিক যত ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, বাবু তুমি জানবে, শ্রীমতীর কাছে তোমার জায়গা সবার উপরে।"
শ্রীমতী রামনিধির মুখ চুম্বন করতে লাগল। রামনিধি জিভে টের পেলেন লবণাক্ত স্বাদ। তার মানে শ্রীমতী কাঁদছে। তেমন করে তো শ্রীমতীর মুখ দেখা যাচ্ছে না! আজ কেন যে চুল বাঁধেনি! তার দীর্ঘ এলায়িত চুলরাশি রামনিধির চোখের উপর এসে পড়ায় চোখ বন্ধ করতে হয়েছে। শ্রীমতীর বুকের ভেতর কী উথাল-পাথাল হচ্ছে, তা সে-ই জানে। সে এত আকুল কেন আজ! শ্রীমতী আবার তার বুকের উপর উঠে পড়েছে। রামনিধির মুখমণ্ডলের উপর গরম জলের প্রবাহ নেমেছে।
রামনিধি আজ ক্লান্ত হননি। স্ত্রী পঞ্চম সন্তানসম্ভবা। ফলে শরীর অনেক দিনই উপবাসে আছে। রামনিধি নিজের শরীর নিষ্কাষণ করে তেজে সম্পূর্ণ করে দিতে পেরেছেন শ্রীমতীকে। তার পর ক্লান্ত শ্রীমতীকে শয্যায় রেখে উঠে এসে নিজের পরিধেয় পরে নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন বিছানার উপর সম্পূর্ণ নগ্ন একখণ্ড জ্যোৎস্না শুয়ে আছে।
শ্রীমতী শুয়ে-শুয়েই বলল, "নিধুবাবু, যাচ্ছ? আচ্ছা যাও। রাত হয়ে যাচ্ছে। কাল একটি বার এসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।"
পরের দিন রামনিধি গুছিয়ে বসেছেন। লাল মদ ভর্তি গ্লাস, আখরোট আর কাজুবাদাম রেখে দাসী চলে যাওয়ার পর শ্রীমতী বলল, "বাবু, আমায় মাফ কোরো, কাল আমি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।"

(ক্রমশ)

অলংকরণ: সৌমেন দাস



ছোট থেকেই সকলকে যথাযথ যৌনশিক্ষা দেওয়া জরুরি। এতে শিশুমনে ভ্রান্তধারণা তৈরি হওয়াকে যেমন আটকাতে পারবেন, তেমনই ওদের দায়িত্বশীল করে তোলাও সহজ হবে। একটি আলোচনা।

সেক্স এডুকেশন জরুরি

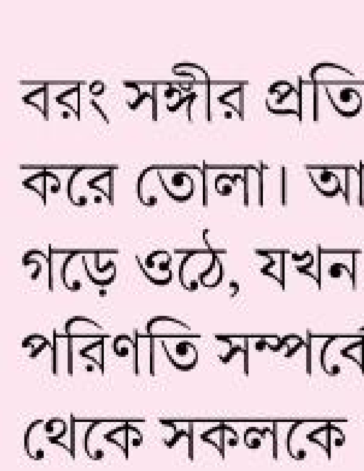
সম্প্রতি একটি গেট টুগেদারে একটি বাক্যালাপ কানে এল। এক মহিলা বলছিলেন, "খবরের কাগজে তো আজকাল চোখ রাখাই যায় না! মিডিয়া যৌনতা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে। এতেই তো লোকের মাথায় এইসব উলটোপালটা চিন্তা ঢোকে।" অন্য একজনকে আবার তাঁর সপক্ষে বলতে শুনলাম, "নিউজ়পেপারগুলোর সেন্সর্ড হওয়া উচিত। এতদিন তো যৌনতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেই সবাই বড় হয়েছে। তাতে ক্ষতি তো কিছু হয়নি। তাহলে আমরা কেন তা মানব না? মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েগুলো স্পয়েলড হয়ে যাচ্ছে।"

কথাগুলো শুনে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম। এই চিন্তাধারার মানুষগুলো যে ভয় আজও পুষে রেখেছেন মনে, তা স্রেফ অজানার ভয় নয়। যৌনতা সম্পর্কে এহেন অস্বাচ্ছন্দ্যের নেপথ্যে কোথাও না কোথাও নিজের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধও লুকিয়ে রয়েছে। গণমাধ্যমগুলো তো স্রেফ তাদের সামাজিক কর্তব্য পালন করছে। কারণ যথাযথ সেক্স এডুকেশন এখনও এই সমাজে নিষিদ্ধ। অথচ এটি লাইফ স্কিল এডুকেশনের মধ্যে পড়ে। ছোটদের যেভাবে পড়াশোনা বা অন্যের সঙ্গে ইন্টার‍্যাক্ট করতে শেখানো হয়, সেভাবেই অ্যাডাল্ট লাইফ সিচুয়েশন বা অ্যাক্টিভিটির সঙ্গেও তো পরিচয় করাতে হবে। নাহলে বিষয়টা, একজন কৃষককে প্রশিক্ষণ ছাড়াই অস্ত্র ধরিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়ারই সমান।

প্রথাগত সেক্স এডুকেশন ছাড়াই সময়ের আদি থেকে বিবাহ-পূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে আসছে। এটি নতুন কিছু নয়। ফলে কী কী করণীয় নয়, তা কম-বেশি সকলেই জেনে যান। কিন্তু সেক্স এডুকেশনের মূল উদ্দেশ্য হল করণীয় বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া। ব্যাপারটা অনেকটা বিমার মতো। ঠিক যেমন বাড়তি সুরক্ষার জন্য আমরা বিমা করাই, তেমনই সেক্স এডুকেশনও আমাদের সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে বাড়তি সুরক্ষা দেয়। তাছাড়া যৌন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু সচেতনতা বাড়ানো নয়, বরং সঙ্গীর প্রতি আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তোলা। আর দায়িত্ববোধ তখনই গড়ে ওঠে, যখন কেউ তাঁর কাজের পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়। ফলে, ছোট থেকে সকলকে যৌন শিক্ষায় সচেতন করে তুললে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে, সে বিষয়েও সচেতনতা বাড়বে।

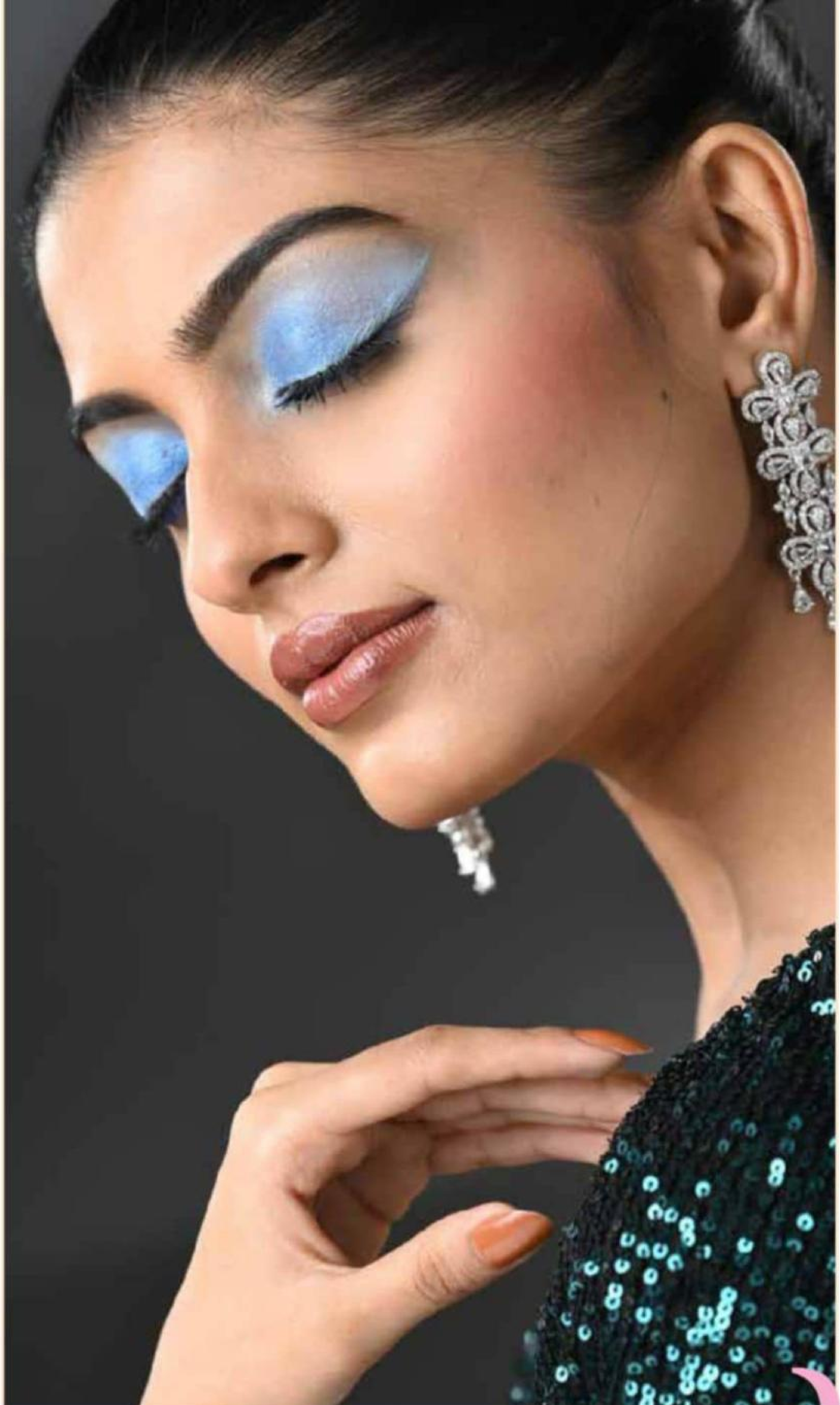
অভিভাবকদেরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাচ্চা কোনও দ্বিধায় পড়লে তো প্রথমে বাবা-মায়ের কাছেই আসবে। তাই তাঁদেরও যৌন শিক্ষায় সচেতন হতে হবে। অন্তত এতে বাচ্চার কাছে ভুল তথ্য পৌঁছনো বন্ধ হবে। সমাজকে যৌন সচেতন করে তুলতে এটুকু কর্তব্যপালন করাই যায়।

ছবি: আইস্টক



ডা. ডি নারায়ণ রেড্ডি

যোগাযোগ:
deganr@gmail.com
degainstitute@gmail.com



যাঁরা খুব লাউড মেক-আপ চান না, তাঁরা স্কাই ব্লু পার্লি শেড বা স্যাটিন শেড ব্যবহার করতে পারেন। এতে সফ্ট এফেক্ট আসবে।





১ দু’ শেডের স্কাই ব্লু ও একটা স্কিন শেড রাখুন। প্রথমে স্কিন শেড আইলিডে ব্লেন্ড করে নিন।



২ এবার প্রথমে গাঢ় রং ব্লেন্ড করে উপরে হালকা স্কাই ব্লু দিয়ে আপার ল্যাশলাইন হাইলাইট করুন।



৩ লোয়ার ল্যাশলাইনে আবার ব্যবহার করুন গাঢ় রং। এতে অমব্রে এফেক্ট আসবে চোখে।



৪ যেহেতু বোল্ড আই মেক-আপ, তাই লিপস্টিক ও ব্লাশ হালকা রঙের রাখুন।

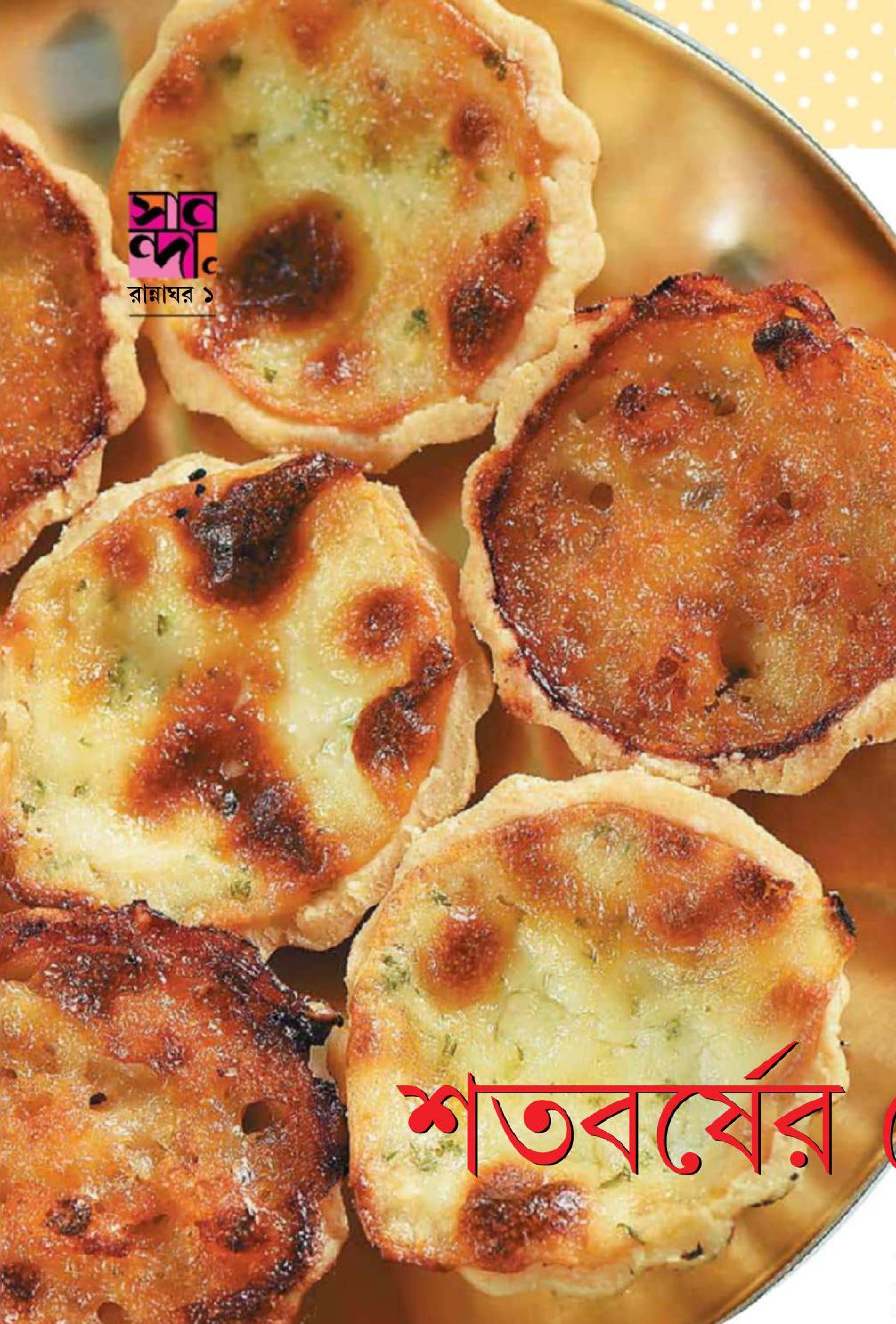
Sky হাই

সামার কালার হিসেবে এই রঙের জনপ্রিয়তা সত্যিই আকাশছোঁয়া। চোখের ক্যানভাস আকাশি রঙে সাজিয়ে তোলার পরামর্শ।

সামার কালার্স হিসেবে খুব জনপ্রিয়। স্নিগ্ধ এবং সাহসী। সব মিলিয়ে এই কুল টোন সত্যিই সুপারকুল। যাঁরা সাজগোজ নিয়ে নিত্যদিন এক্সপেরিমেন্ট করেন, তাঁরা আকাশিকে বরাবরই প্রথম সারিতে রাখেন। আবার যাঁরা মিনিম্যাল সাজে বিশ্বাসী, তাঁরাও গরম পড়লে আকাশিকে সযত্নে আপন করে নেন। লাইনার, শ্যাডো, ইনার কর্নার হাইলাইট... চোখের ক্যানভাসে এক টুকরো আকাশ ফুটিয়ে তোলার উপায় তো অনেক। আমাদের যদিও সবই পছন্দ। তাই বোল্ড আই মেক-আপই বেছে নিলাম আমরা। আপনারা চাইলে টোন ডাউন করে নিতে পারেন...



ছবি: সোমনাথ রায়



Shrimp Quiche

১০০ বছর পার করল আনন্দবাজার পত্রিকা। তার উদ্‌যাপনে ওবেরয় গ্র্যান্ডের স্পেশ্যাল মেনুতে ছিল এমন এক্সক্লুসিভ কিছু পদ, সহজে যাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা রীতিমতো কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজকে সহজ করে দিলেন গ্র্যান্ডের এগজ়িকিউটিভ শেফ পাপু সিংহ। সঙ্গী ও সাক্ষী রইল সানন্দা।

শতবর্ষের সেরা স্বাদ

‘শীর্ষ বাছাই’ বলে খবরের জগতে একটি জনপ্রিয় শব্দবন্ধ রয়েছে। সেই খবরের প্রতিষ্ঠান যদি দেখতে দেখতে একশো বছর পার করে ফেলে, তারা রন্ধনশিল্পের জগতেও তো নিশ্চিতভাবেই কিছু ‘শীর্ষ বাছাই’ তৈরি করবে। তেমনই ব্যতিক্রমী কিছু পদ কিউরেট করা হয়েছিল এই উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে। ফলে পাঠকই যাঁদের কাছে শেষ কথা, তাঁরা কেন বঞ্চিত থাকবেন সেই স্বাদে? সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ স্বাদ-বর্ণ-গন্ধে রঙিন ও সুবাসিত হোক পাঠকের রান্নাঘরও। বাংলা শুধু নয়, ভারতের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় উদ্ভাসিত এইসব রেসিপি যেন শুধু রসনাতৃপ্তি নয়, এক বৃহত্তর জগতে ‘মেলাবেন, তিনি মেলাবেন’-এর মতো সবরকম সীমাবদ্ধতার চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়া।

স্যামন মুজ় অ্যান্ড মাশরুম পাতে

(Salmon Mousse and Mashroom Pate)

সিল্কি স্যামন মাছের এই ‘পাতে’ একটি এক্সক্লুসিভ ফরাসি স্টার্টার

উপকরণ: স্যামন মুজ়ের জন্য : সেদ্ধ স্যামন মাছের ছোট ছোট টুকরো ১ কেজি, নুন ১০ গ্রাম, রসুন ৫ গ্রাম, মাখন ২৫০ গ্রাম, হোয়াইট সস ১০০ গ্রাম, ক্রিম ২৫০ গ্রাম, ডিল ১০ গ্রাম, কেপার্স ১৫ গ্রাম

মাশরুম পাতে-র জন্য : রোস্টেড বাটন মাশরুম ৫০০ গ্রাম, মাখন ১৫০ গ্রাম, রসুন ৫ গ্রাম, থাইম ১০ গ্রাম, ওয়ালনাট ১০০ গ্রাম, পোর্ট ওয়াইন ৩০ মিলি, ক্রিম



Salmon Mousse and Mashroom Pate

২৫০ গ্রাম।
প্রণালী: দুটো মিশ্রণের ক্ষেত্রেই উপকরণগুলো ফুড ব্লেন্ডারে দিয়ে মিহি করে পেস্ট করে নিন। মিশ্রণে জমাট বাঁধা অংশ থেকে গেলে ছাঁকনির সাহায্যে সেগুলো দূর করতে পারেন। টক ঝাল নুন মিষ্টি সব ঠিক আছে মনে হলে মিশ্রণগুলো ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। পরিবেশন করার আগে বেলুন হুইস্ক দিয়ে মিশ্রণটা ভাল করে নেড়ে নিন। তারপর পাইপিং ব্যাগের সাহায্যে বাটি বা চামচে সাজিয়ে দিতে পারেন। কিংবা ঠান্ডা অবস্থাতেই জিনিসটাকে কুড়মুড়ে টোস্টের উপর সরাসরিও দিতে পারেন।

শ্রিম্প কিশ (Shrimp Quiche)

কিশও একধরনের ফরাসি সেভরি টার্ট, যা মূলত পারমেজ়ান ও অন্যকিছু দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এক্ষেত্রে যেমন, অন্যকিছু মানে শ্রিম্প বা চিংড়ি

উপকরণ: সল্ট পেস্ট ডো-এর জন্য: মিহি ময়দা ৭৫০ গ্রাম, মাখন ৫০০ গ্রাম, ৩টে ডিম, নুন ১২ গ্রাম
এগ কাস্টার্ডের জন্য: ১০টা ডিম, দুধ ১ লিটার, ক্রিম ১ লিটার, নুন ৫ গ্রাম, অত্যল্প নাটমেগ
শ্রিম্প ফিলিং-এর জন্য: শ্রিম্প ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৭৫ গ্রাম, রসুন ৫০ গ্রাম, মাখন ১০০ গ্রাম, হোয়াইট সস ১০০ গ্রাম, ক্রিম ৫০ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম, গোলমরিচ ৫ গ্রাম, পার্মিয়ান চিজ ৫০ গ্রাম, থাইম ২ গ্রাম, অলিভ অয়েল ৫০ মিলি।
প্রণালী: সল্ট বেসের জন্য: প্যালেট নাইফের সাহায্যে একটা মিক্সিং বোলে মাখনটাকে পাতলা করে নিন। এতে ময়দা আর নুন অল্প অল্প করে দিয়ে নাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না সুন্দর মিশ্রণ তৈরি হয়। হয়ে গেলে ওতে একটা একটা করে ডিম দিতে থাকুন যতক্ষণ না একটা ডো তৈরি হচ্ছে। হয়ে গেলে ব্যাপারটাকে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা হতে দিন।
শ্রিম্প ফিলিংয়ের জন্য :
ফ্রাইয়িং প্যানে রিফাইন্ড তেল গরম করে হালকা আঁচে পেঁয়াজ ভেজে নিন যতক্ষণ না লালচে রং ধরছে। তারপর তাতে রসুন দিয়ে নেড়ে নিন। এবার ওর মধ্যে টুকরো টুকরো শ্রিম্প আর মাখন ঢেলে দিন। শ্রিম্প ৫০% রান্না হয়েছে মনে হলে ওতে হোয়াইট সস, নুন, মিষ্টি, টক, ঝাল আর হার্বস দিয়ে স্বাদ পরখ করে নিন।
কাস্টার্ডের জন্য: সমস্ত উপকরণ নেড়েচেড়ে একটা উত্তম মিশ্রণ বানিয়ে নিন।
সব শেষে : ডো-টাকে ২ মিলিমিটার পাতলা করে বেলে নিন। এবার কিশ বানানোর মোল্ডের ভিতরে ডো-টা ভাল করে ছড়িয়ে লাগিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন ঠান্ডা হতে। ডো শক্ত হয়ে গেলে, পছন্দ মতো ফিলিং-এর সঙ্গে কাস্টার্ড মিশিয়ে, সেই মিশ্রণটি ঢেলে দিন মোল্ডের বাটির মধ্যে। শেষে কিশগুলো ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০-১৫ মিনিট বেক করুন, যতক্ষণ না মিশ্রণের উপরটায় বাদামি-সোনালি রঙ ধরছে এবং কিশের বাটিটার নীচের অংশ পর্যন্ত ভালভাবে বেক হচ্ছে।

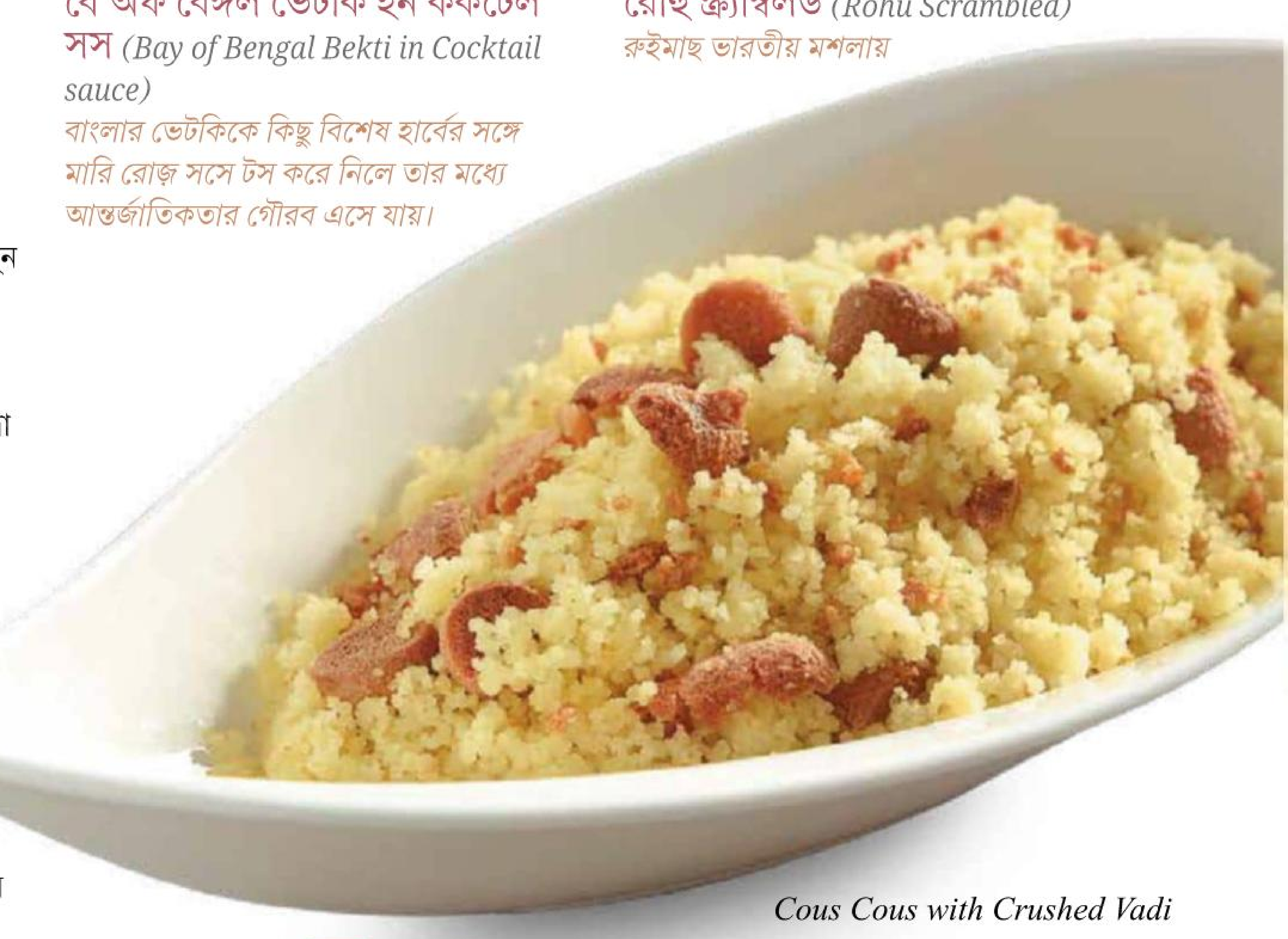
বে অফ বেঙ্গল ভেটকি ইন ককটেল সস (Bay of Bengal Bekti in Cocktail sauce)

বাংলার ভেটকিকে কিছু বিশেষ হার্বের সঙ্গে মারি রোজ় সসে টস করে নিলে তার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার গৌরব এসে যায়।

উপকরণ: ভেটকি ফিলে ১০০ গ্রাম (টুকরো করা), অ্যাভোকাডো ১৫০ গ্রাম, সবুজ আঙুর ১৫০ গ্রাম, পার্সলে ১০ গ্রাম, গ্রিন পেপার কর্ন ১০ গ্রাম, মাখন ১০০ গ্রাম।
ককটেল সসের জন্য: মেয়োনিজ ৫০০ গ্রাম, ওরসেস্টারশায়ার সস ৫ মিলি, টাবাস্কো সস ৫ মিলি, টম্যাটো কেচাপ ১০০ গ্রাম, ডিজঁ মাস্টার্ড ৫ গ্রাম, ব্র্যান্ডি ৫০ মিলি, নুন স্বাদমতো।
প্রণালী: ককটেল সসের জন্য: একটা মিক্সিং বোলে সমস্ত উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে স্বাদ পরখ করে নিন।
এবার ভেটকি ফিলেতে নুন মাখিয়ে মিনিট বারো সেদ্ধ করুন। হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা হতে দিন। একটা মিক্সিং বোলে অ্যাভোকাডো, সবুজ আঙুর, ভেটকি আর গ্রিন পেপারকর্ন মিশিয়ে নিন। সবকিছু একত্রে মিশিয়ে ঠান্ডা অবস্থায় পরিবেশন করুন।

রোহু স্ক্র্যাম্বলড (Rohu Scrambled)

রুইমাছ ভারতীয় মশলায়



Cous Cous with Crushed Vadi



Rohu Scrambled

ডাবল কুক করে কাঁটা ছাড়িয়ে আলু ও পেঁয়াজের সঙ্গে স্ক্র্যাম্বল করলেই এই ডিশ তৈরি

উপকরণ: রুই ১ কেজি, পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, আলু ২০০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ৫০ গ্রাম, আদা ৫০ গ্রাম, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ৪০ গ্রাম, হলুদ ২৫ গ্রাম, ধনেগুঁড়ো ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ১০ গ্রাম, সরষের তেল ২৫০ মিলি, পাঁচফোড়ন ১০ গ্রাম, নুন ৫০ গ্রাম।

প্রণালী: নুন, লাল লঙ্কাগুঁড়ো আর হলুদ দিয়ে মাছটা ম্যারিনেট করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে যাওয়ার একটু পর মাছের কাঁটা বেছে নিন। প্যানে সরষের তেল দিয়ে অল্প গরম করুন। তারপর ওতে পাঁচফোড়ন, আদা, লঙ্কা দিয়ে নেড়ে নিন। এবার পেঁয়াজকুচি দিয়ে খানিকক্ষণ ভেজে নিন। হয়ে গেলে ওতে সেদ্ধ আলুর টুকরো দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন আলুগুলো হালকা বাদামি রং ধরা অবধি। এবার সমস্ত মশলা দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। সবার শেষে কাঁটা ছাড়ানো মাছের টুকরোগুলো ছাড়ুন। নুন ঝাল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে রান্না করতে থাকুন। ভাল মতো রান্না হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রোস্ট লেগ অফ মাটন

(Roast leg of Mutton)

হাড়সহ মাটন লেগ পুরোটা রোস্ট করে সুগন্ধি জুস ও গরমমশলার সুবাসে স্লাইস করে কেটে নেওয়াই এই পদের অভিনবত্ব

উপকরণ: মাটন লেগ ১টি, আদা ৭৫ গ্রাম, রসুন ৭৫ গ্রাম, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ৪০ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো ২০ গ্রাম, ধনেগুঁড়ো ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ৩০ গ্রাম, ভিনিগার ১০০ মিলি, টম্যাটো পিউরে ১০০ মিলি, পেঁয়াজ ২৫০ গ্রাম, সবুজ এলাচ ৫ গ্রাম, কালো এলাচ ৫ গ্রাম, তেজপাতা ২ গ্রাম, লবঙ্গ ২ গ্রাম, দারচিনি ৫ গ্রাম, জয়িত্রী ২ গ্রাম, কালো গোলমরিচ ২ গ্রাম, স্টক বানানোর জন্য ল্যাম্ব বোন ১০ কেজি, রিফাইন্ড তেল ৫০ মিলি।

প্রণালী: আদা-রসুনবাটা, ভিনিগার, নুন, লাল লঙ্কাগুঁড়ো আর গোটা মশলা দিয়ে মাটন লেগ ম্যারিনেট করে রাতভর ফ্রিজে রেখে দিন। প্যানে তেল নিয়ে অল্প গরম করুন। ওতে মাটন লেগটা দিয়ে হালকা ভেজে নিন। একটা রোস্টিং প্যানে পেঁয়াজকুচি, মাটন স্টক আর মাটন লেগটা দিন। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৯০ মিনিট ধরে লেগ সেদ্ধ হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে ওটাকে আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। এবার সস বানানোর জন্য প্যানে তেল গরম করে গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিন। ভাজা হলে ওতে আদা-রসুন পেস্ট সহ সমস্ত গুঁড়োমশলা দিয়ে মিনিট সাতেক নেড়ে তারপর ওর মধ্যে টম্যাটো পিউরে দিয়ে দিন। টম্যাটোও রান্না হয়ে গেলে ওতে মাটন স্টক দিয়ে মিনিট পনেরো রান্না করুন। এবার মাটনের



স্ক্র্যাম্বলড ছানা





Orzo rice with Fried lentil

টুকরো করে নিয়ে তার মধ্যে সিজনড মাটন স্টক ঢেলে দিন আর গরম গরম পরিবেশন করুন।

পোর্তোবেলো রোস্ট

(Portobello Roast)

ইতালি ও ভারতীয় স্বাদের মেলবন্ধন। ইতালিয়ান পোর্তোবেলো মাশরুমকে ভারতীয় মশলায় রোস্ট করে মাশরুম উমামি ব্রথের সঙ্গে এটি পরিবেশন করা হয়

উপকরণ: ইতালিয়ান পোর্তোবেলো মাশরুম ৫০০ গ্রাম, আদা-রসুন পেস্ট ৪০ গ্রাম, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ৪০ গ্রাম, নুন ৩০ গ্রাম, গরম মশলা ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ১৫ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম।

প্রণালী: নুন, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো আর আদা-রসুন বাটা দিয়ে মাশরুমকে ম্যারিনেট করে নিন। আগে থেকে গরম করে রাখা আভেনে ২১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫-২০ মিনিট মিশ্রণটাকে রোস্ট করুন। মাশরুম রান্না হয়ে গেলে আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। মাশরুম থেকে বেরোনো সমস্ত জুস একটা সসপ্যানে নিয়ে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণ ফুটে পরিমাণে অর্ধেক হলে ওর মধ্যে ঠান্ডা মাখন আর গরম মশলা মিশিয়ে একটা ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এই সসটা এবার মাশরুমের উপর ঢেলে গরমাগরম পরিবেশন করুন।



রসগোল্লার চাটনি



তেলবিহীন লঙ্কার আচার



অলিভ চাটনি

ব্ল্যাক হ্যাশ পট্যাটো

(Black Hash Potato)

হ্যাশব্রাউন পট্যাটোকে দেশি ও বিদেশি উপকরণে ভারতীয় 'দম'-এ রান্না করার স্বাদ পাওয়া যাবে এই ডিশে

উপকরণ: সেদ্ধ চন্দ্রমুখী আলু ১ কেজি, ক্যারামেলাইজড অনিয়ন ২০০ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম।





Portobello Mushroom



পাপু সিংহ

"When challenged to curate a unique dining experience for such a presitigious centenary event for its distinguished guests, we had to break our boundaries into creating dishes and flavour combinations that would resonate throughout the city and be remembered in times to come. With a think Global, Eat Local' concept, we wanted to showcase the enormous possibilities and potential of our nation's produce and its resources as it is the way forward.

ব্ল্যাকেন্ড স্পাইস-মিক্স-এর জন্য: ব্ল্যাক পেপারকর্ন ৫০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ৩০ গ্রাম, এলাচগুঁড়ো ১০ গ্রাম, দারচিনিগুঁড়ো ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ১০ গ্রাম, লবঙ্গগুঁড়ো ১০ গ্রাম।
সস-এর জন্য: রিফাইন্ড অয়েল ১০০ মিলি, পেঁয়াজকুচি ১৫০ গ্রাম, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১৫ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ২০ গ্রাম, অত্যল্প ময়দা, মাখন ২০০ গ্রাম।
প্রণালী: ব্ল্যাকেন্ড স্পাইস মিক্স তৈরি করার জন্য সব মশলা একত্রে মিশিয়ে নেড়ে নিন। সেদ্ধ আলু গ্রেট করে ঝুরো ঝুরো করে নিন। তাতে মিশিয়ে দিন ক্যারামেলাইজড অনিয়ন, নুন আর ব্ল্যাকেন্ড স্পাইস। স্বাদ পরখ করে নিয়ে কাটলেট শেপে হ্যাশব্রাউন তৈরি করে নিন। সসপ্যানে পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে গুঁড়োমশলাগুলো দিয়ে দিন। সামান্য জল দিয়ে আর-একবার স্বাদ পরখ করে নিন। এই সসে ব্ল্যাকেন্ড স্পাইস মিশিয়ে অল্প ময়দাও দিয়ে দিন। শেষে মাখন ঢেলে দিন। এবার একটা নন স্টিক প্যানে মাখন গরম করে হ্যাশব্রাউনগুলো ভেজে নিন যতক্ষণ না দু'পিঠেই সোনালি বাদামি রং ধরে। সুন্দর ভাজা হলে উপরে সস ঢেলে পরিবেশন করুন।

স্ক্র্যাম্বলড ছানা

গরুর দুধের ছানা শুকনো করে আলু, পেঁয়াজ ও আদা দিয়ে টস করে বড়ি দিলে তৈরি স্ক্র্যাম্বলড ছানা

উপকরণ: তেল ১০০ মিলি, জিরে ১০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১৫০ গ্রাম, টাটকা ছানা ১ কেজি, নুন ৩০ গ্রাম, সেদ্ধ ও টুকরো করা আলু ১০০ গ্রাম।
প্রণালী: সসপ্যানে তেল গরম করুন। ওতে জিরে দিয়ে গরম করুন। জিরে ফাটতে শুরু করলে ওতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে অল্পক্ষণ ভাজুন। এবার আলুর টুকরো ছেড়ে দিয়ে জিরে আলুর উপর থিতু না হওয়া অবধি ভাজতে থাকুন। তারপর ছানা ঢেলে দিন। স্বাদ পরখ করে নিয়ে ভাল করে রান্না করুন। হয়ে গেলে আভেন থেকে নামিয়ে গরম গরম পাতে তুলে নিন।

কুস কুস উইথ ক্রাশড বড়ি

(Cous Cous with Crushed Vadi)

একটি বিশেষ ধরনের উত্তর আফ্রিকান সুজির পদ হল, কুস কুস। তার সঙ্গে মিশেছে ভারতীয় বড়ি ও মশলার স্বাদ

উপকরণ: কুস কুস ২৫০ গ্রাম, নুন ২০ গ্রাম, বড়ি ১০০ গ্রাম, ঘি ১০০ মিলি, রিফাইন্ড অয়েল ১০০ মিলি।



Roast leg of Mutton

প্রণালী: সবার আগে ফুটন্ত জলে অল্প তেল দিয়ে তাতে কুস কুস ভিজিয়ে রাখতে হবে। পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে। মিনিট পনেরো। অন্য দিকে রিফাইন্ড তেলে বড়ি ভেজে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। একটা প্যানে অল্প ঘি গরম করে কুস কুস হালকা ভেজে নিতে হবে। তারপর ওতে বড়ি ভাজা আর নুন দিতে হবে। হয়ে গেলে স্ক্র্যাম্বলড রহু-র সঙ্গে কুস কুস পরিবেশন করতে পারেন।

ওরজ়ো রাইস (*Orzo Rice*)

বিশেষ পাস্তাকে রাইসের নাম দিয়ে ফ্রায়েড লেন্টিল বা ঘন ডাল দিয়ে খাওয়ার অভিনব পদ

উপকরণ: ওরজ়ো ১ কেজি, সেদ্ধ করে কেটে রাখা আলু ২০০ গ্রাম, ফুলকপির ফুল সেদ্ধ ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২০০ গ্রাম, নুন ৩০ গ্রাম, ঘি ১০০ মিলি, মাখন ১০০ গ্রাম।

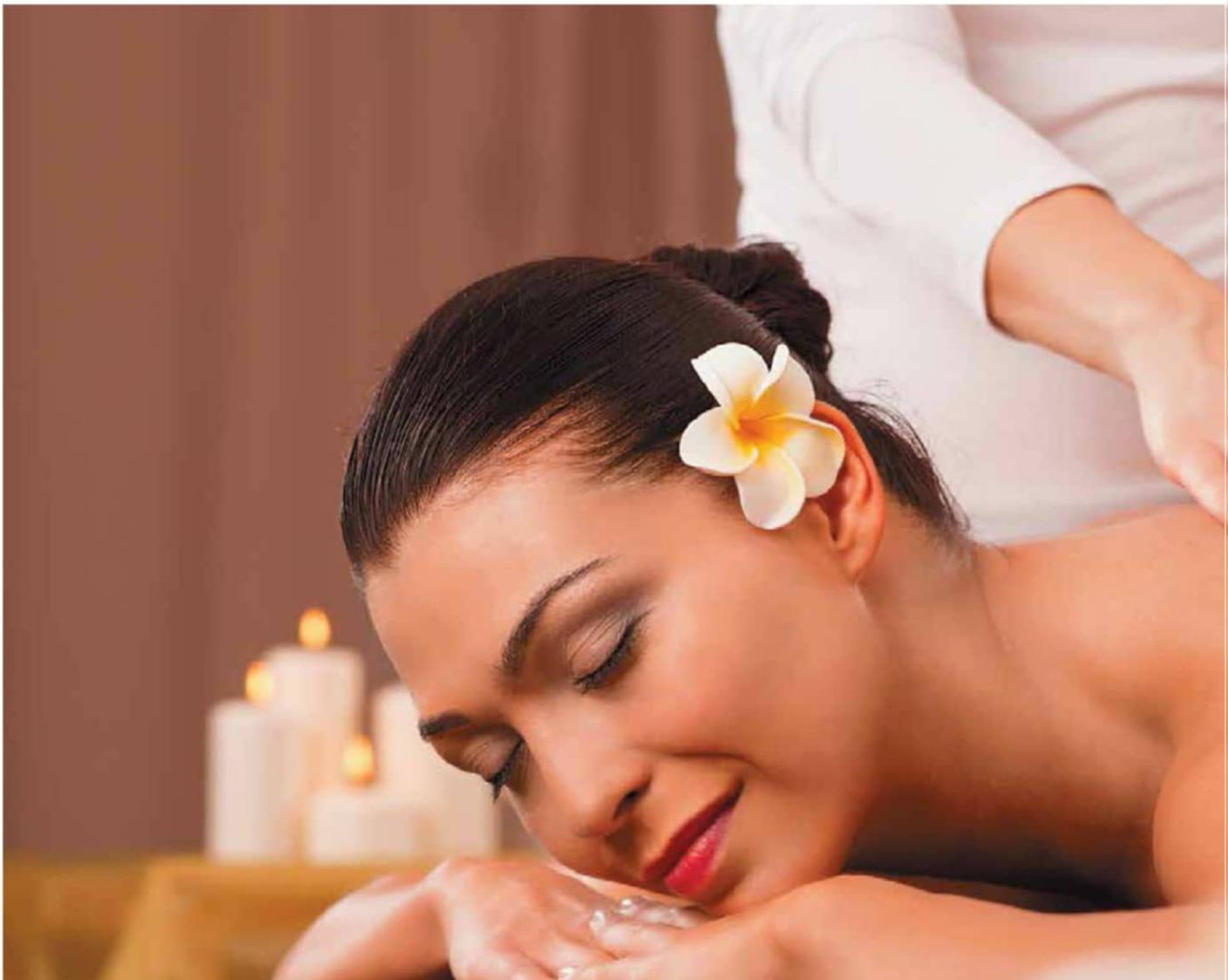
প্রণালী : লবণজলে ওরজ়ো পাস্তা খুব নরম না হওয়া অবধি ফুটিয়ে নিন। বাড়তি জল ফেলে দিয়ে পাস্তা আলাদা করে রাখুন। নন স্টিক প্যান/কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ, আলু আর ফুলকপি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এবার ওতে সেদ্ধ ওরজ়ো দিয়ে নুন টক ঝাল মিষ্টি পরখ করে নিন। ভাল করে নেড়েচেড়ে অল্প মাখন ঢেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে... পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত এসে মিশেছে ভারতীয় এবং বাঙালির রসনায়। শেষ পাতে ছিল কুমড়োর হালুয়া ও চালকুমড়োর জিলিপি। এই স্বাদকে শতবর্ষ সেরা বললে অত্যুক্তি হবে না নিশ্চয়ই!

লেখা: পায়েল সেনগুপ্ত
ছবি: শুভেন্দু চাকী
রেসিপি সৌজন্য: কেজ়াং রাই, সু শেফ, দি ওবেরয় গ্র্যান্ড



Bay of Bengal bekti in Cocktail Sauce



ভারতীয় সনাতন চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্ট্রেস কমানোর রহস্য। আয়ুর্বেদের সাহায্যে কীভাবে মন শান্ত রাখবেন? কীভাবে দূর হবে অ্যাংজ়াইটি, স্ট্রেস, টেনশন? জানাচ্ছেন আয়ুর্বেদাচার্য ও সিনিয়র ফিজ়িশিয়ান ড. নভনীত। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

স্ট্রেস কমাতে আয়ুর্বেদ

এখনকার দিনে স্ট্রেস আমাদের জীবন ও যাপনের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে, তা বোধহয় আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না! বলা যেতে পারে, স্ট্রেস আর জীবনযাত্রা সমার্থক। ডেডলাইন, কাজের চাপ, পিয়ার প্রেশার, সাফল্যের ইঁদুরদৌড়, সম্পর্কে সমস্যা, শারীরিক অসুখ, আর্থিক সমস্যা... আমার-আপনার জীবনে এগুলোর একটাও বা অন্য কোনও এমন অনুঘটক কি নেই, যা থেকে মন অশান্ত হয়? এ সবের প্রভাব গিয়ে পড়ে আপনার চিন্তাভাবনা, ব্যবহার, শারীরিক প্রতিক্রিয়া সব কিছুর উপরেই। আমাদের চাহিদা ও সেই চাহিদার অনুপাতে আমরা কতটা মানিয়ে নিতে পারছি, সেই ভারসাম্যের উপরেই নির্ভর করে স্ট্রেসের মাত্রা। আর এই চাহিদা-চাহিদা পূরণের ব্যালান্স কিন্তু এক একজনের কাছে একরকমের। যেমন ধরুন, কোনও একটি পরিস্থিতি কারও কাছে দারুণ চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হল। তিনি সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার জন্য সবকিছু দিয়ে ঝাঁপাতে চাইবেন। আবার সেই একই পরিস্থিতি অন্য একজনের কাছে হয়তো স্ট্রেসফুল, তিনি তার মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ খুঁজেই পাবেন না! আর স্ট্রেসফুল পরিস্থিতি তৈরি হলে তা থেকে অ্যাংজ়াইটি, ক্লান্তি, ইটিং ডিসঅর্ডার, মাথাব্যথা, মনোযোগের অভাব, ডিপ্রেশন, সম্পর্কে



> স্ট্রেস নিরাময়ের জন্য আয়ুর্বেদে মূলত তিনটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়: নিদান পরিবর্জন, শোধন, শমন। স্ট্রেসের লক্ষণ নিয়ে একজন আয়ুর্বেদাচার্যর কাছে হাজির হলে তিনি ত্রিবিধ/অষ্টবিধ/দশবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেন।

সমস্যা ইত্যাদিও হতে পারে। আয়ুর্বেদ কীভাবে স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে তা বোঝার আগে স্ট্রেস সম্পর্কে আর একটু বিশদে বুঝে নেওয়া যাক।

স্ট্রেস হলে কী হয়?

আমাদের ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার, জীবনযাত্রার ধরন এসবকিছুর উপরেই কিন্তু নির্ভর করে স্ট্রেসের মাত্রা। রাগ, অধৈর্য লাগা, অ্যাংজ়াইটি, ভয়-সহ নানা পারিপার্শ্বিক ফ্যাক্টর শরীরের স্ট্রেস রেসপন্সকে উসকে দেয়। আর এর সঙ্গে যদি যোগ হয় অনিয়মিত জীবনযাত্রা, বেহিসেবি খাওয়াদাওয়া, ধূমপান, মদ্যপানের মতো অভ্যেস তাহলে শরীরের উপরেও ধকল বাড়ে। একদিকে স্ট্রেস রেসপন্স অন্যদিকে শারীরিক স্ট্রেন...দুয়ে মিলে মন বড় অস্থির লাগতে শুরু করে। স্ট্রেসের নেপথ্যে কারণ যা-ই হোক না কেন, আসল বিষয় হল প্রত্যাশা আর চাহিদাপূরণের মধ্যেকার ফারাক। এই ফারাকই মনকে অস্থির করে।

স্ট্রেস ও সাইকোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া: হতাশা, মাসল টেনশন, খিটখিটে ভাব, মেজাজ হারানো, মানসিকভাবে নিংড়ে যাওয়া, সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, মানসিক দ্বিধা-সংশয়, মনোযোগ দিতে অসুবিধে, মনে রাখতে না পারা, হঠাৎ হঠাৎ অসম্ভব রেগে যাওয়া বা কেঁদে ফেলা (ইমোশনাল আউটবার্স্ট), অন্যকে বিশ্বাস না করা, ভয় পাওয়া...ইত্যাদি সবকিছু স্ট্রেস-জনিত মানসিক অভিব্যক্তি।

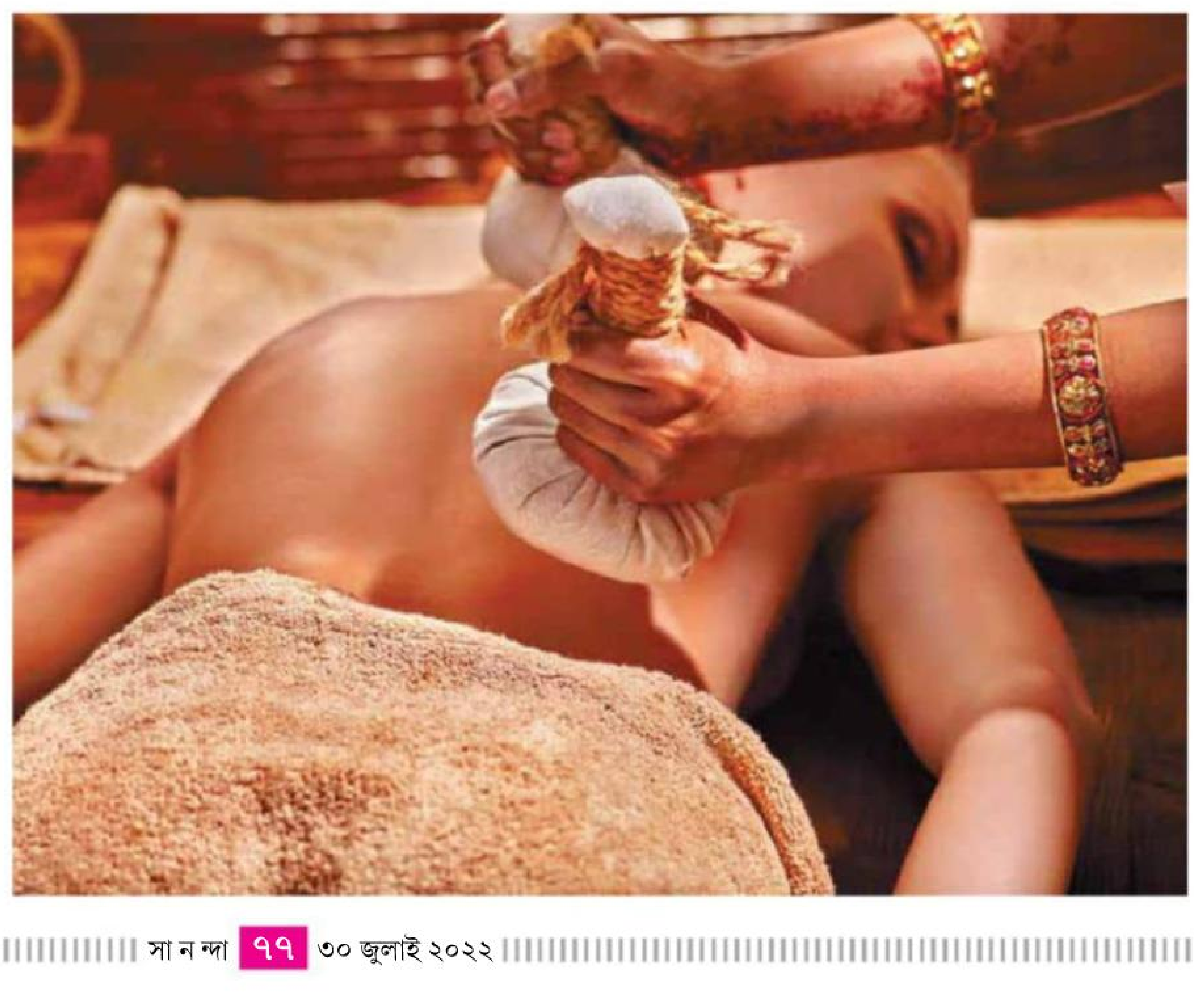
স্ট্রেস ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া: মাথাব্যথা, ক্লান্তি, বমি-বমিভাব, হাত-পা কাঁপা, বুক জ্বালা করা, অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম, বুকে চাপ অনুভূত হওয়া, বুক ধড়ফড়, হার্ট রেট ও ব্লাড প্রেশার বেড়ে বা কমে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, খিদের ধরনে পরিবর্তন, ওজন অতিরিক্ত বেড়ে বা কমে যাওয়া, অনিদ্রা, হরমোনাল ইমব্যালান্স...এসবই হল স্ট্রেস থেকে হওয়া শরীরের প্রতিক্রিয়া।

আয়ুর্বেদ ও স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

আয়ুর্বেদের পরিভাষায় স্ট্রেসকে বলা হয় 'সাহসা'। নার্ভাস সিস্টেমে একধরনের অস্থিরতা বা ডিস্টার্ব্যান্স—এভাবেই স্ট্রেসকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আমাদের শরীরের তিনটি বিশেষ এনার্জি বা 'দোষ': বাত, পিত্ত ও কফ-এর সঙ্গে জড়িয়ে স্ট্রেস। এই 'ত্রি-দোষ'-এর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য সুস্থ শরীর-মনের জন্য জরুরি। আয়ুর্বেদ স্ট্রেসের গোড়ার কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। স্ট্রেসের পরিলক্ষণকে নিয়ন্ত্রণের চেয়েও এটি বেশি জরুরি আয়ুর্বেদে। স্ট্রেস কমানো ও সার্বিক সুস্থতার জন্য চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

- দিনাচার্য (রোজকার নিয়মমাফিক জীবনযাপনের রুটিন)
- ঋতুচার্য (ঋতু অনুযায়ী জীবনযাপনের রুটিন)
- সদবৃত্ত (কোড অফ কনডাক্ট বা সদ-ব্যবহারের নিয়মাবলী)
- আচার-রসায়ন (বিহেভিয়ারাল মেডিসিন)

স্ট্রেস নিরাময়ের জন্য আয়ুর্বেদে মূলত তিনটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়: নিদান পরিবর্জন, শোধন, শমন। স্ট্রেসের লক্ষণ নিয়ে একজন আয়ুর্বেদাচার্যর কাছে হাজির হলে তিনি ত্রিবিধ/অষ্টবিধ/দশবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর স্ট্রেসের গোড়ার কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এই পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে। সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হয় তাঁর স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান। তাঁর সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে এক সপ্তাহ থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ১-২ ঘণ্টার সেশনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কোন কোন পদ্ধতি



ব্যবহার করা হয় আয়ুর্বেদে? সাধারণত কয়েকটি থেরাপির মধ্যে থেকে দু'টি-তিনটি থেরাপি একসঙ্গে প্রয়োগ করা হতে পারে:

কোন কোন থেরাপি কার্যকর?

অ ভ য়া ঙ্গ: অভয়াঙ্গ হল মূলত গরম তেলের সাহায্যে বডি মাসাজ। শারীরিক, মানসিক ও ইমোশনাল চাহিদাগুলোর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য তৈরি করে এই পদ্ধতি। এর ফলে, যে 'দোষ'-এর কথা বললাম, তার মধ্যেও ভারসাম্য আসে। হট অয়েল মাসাজের ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। মনেও শান্তি আসে, শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশিও রিল্যাক্সড হয়।

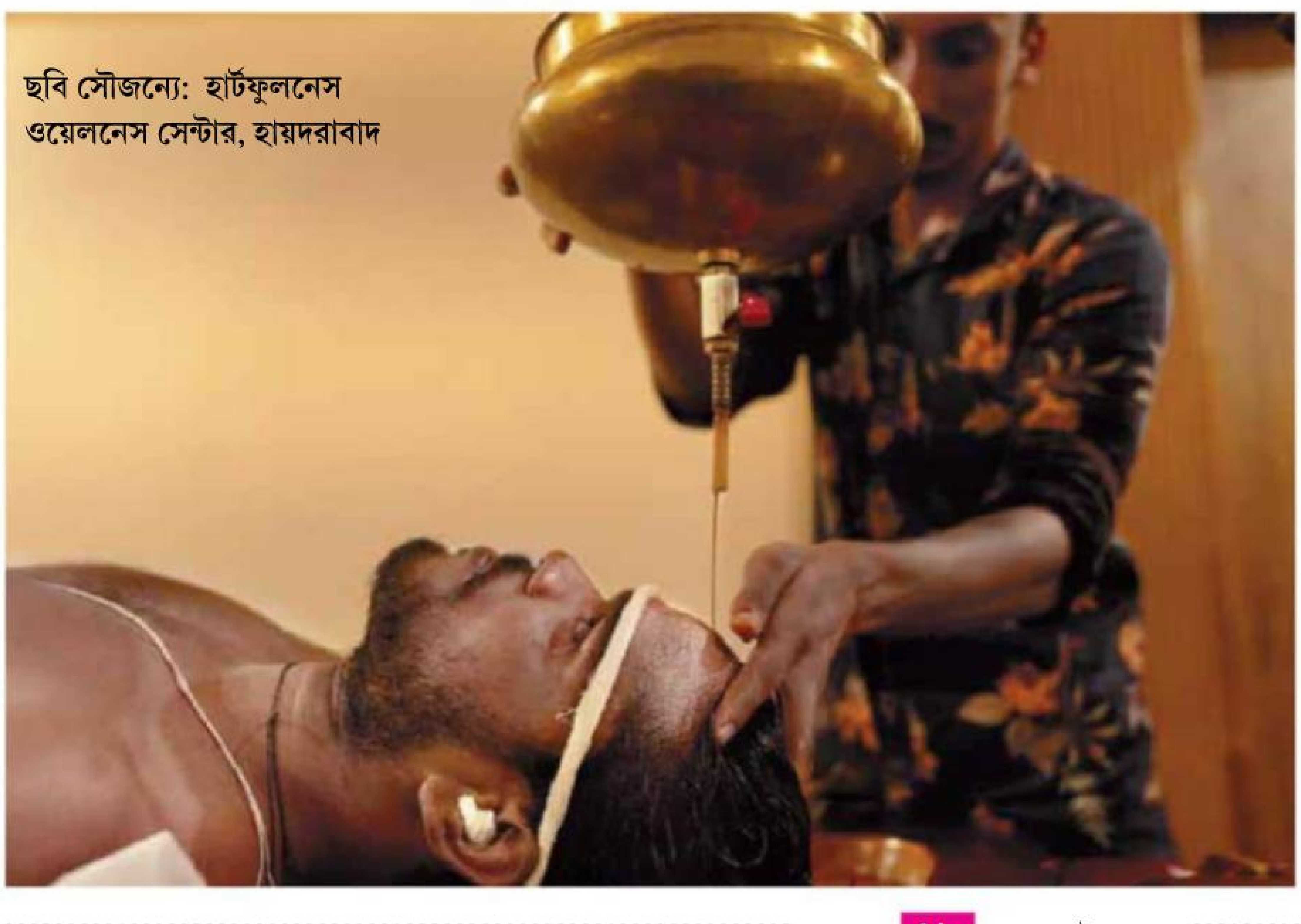
পি রি ছি ল (Pizhichil): অয়েল বাথ। কেরল আয়ুর্বেদের এক অভিনব থেরাপি যার মূল কাজই হল মাসকুলার টোনিং। একাধিক হার্বাল ঈষদুষ্ণ গরম তেলের মিশ্রণ একজন প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট আপনার সারা শরীরে মাসাজ করবেন, একটি বিশেষ রিদমে। এই থেরাপি এক-দেড় ঘণ্টা চলতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী ৭ থেকে ২১ দিন অবধি চলতে পারে এই থেরাপি। রিউমাটিক ডিজ়িজ়, আর্থ্রাইটিস, সেক্সুয়াল উইকনেস, প্যারালিসিসের মতো অসুখের জন্য যেমন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতে পারে, তেমনই নার্ভাস উইকনেস বা নার্ভাস ডিসঅর্ডারের জন্যও কাজে লাগতে পারে। রক্ত সঞ্চালন, মেটাবলিজ়ম, ইমিউনিটি বাড়াতে এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরেই আয়ুর্বেদে স্বীকৃত।

শি রো ধা রা: একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কপালের উপরে উষ্ণ মেডিকেটেড অয়েল পড়বে, আর তাতেই হবে শরীর-মনের রিল্যাক্সেশন। শিরোধারার সঙ্গে সঙ্গে অভয়াঙ্গ থেরাপিও করা হয়। কারণ, একটি নির্দিষ্ট ছন্দে গরম তেল কপালে পড়লে সেই তেল দিয়েই নির্দিষ্ট ছন্দে মাসাজ করা হয়। শিরোধারা শরীর ও মনকে তরতাজা করে।



শি রো অ ভ য়া ঙ্গ ম: মাথা, ঘাড় ও কাঁধে অয়েল মাসাজের সমগ্র পদ্ধতিকেই শিরো অভয়াঙ্গম বলে। আয়ুর্বেদিক হার্বাল তেল দিয়ে এই মাসাজ করা হয়। সাধারণভাবে, ঘাড়, কাঁধ ও মাথা স্ট্রেস পয়েন্ট বলে পরিচিত। এইসব অঞ্চলে স্ট্রেস রিলিফের জন্য ও ব্যথা কমানোর জন্য আদর্শ এই শিরো অভয়াঙ্গম পদ্ধতি।

স্ট্রেস আসলে 'বাত' দোষকে বাড়িয়ে দেয়। তাই এসব থেরাপিই সেই বাত দোষ-কে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমেই স্ট্রেসের মাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হয়। একইসঙ্গে উপরোক্ত সব থেরাপিই মোটামুটি মাংসপেশিকে রিল্যাক্স করতে ও জয়েন্ট মজবুত করতে উপযোগী। রক্ত সঞ্চালনও দ্রুত হয়, ফলে ঘুম ভাল হয়। আর ভাল ঘুম হলে মানসিক শান্তি বজায় থাকবেই। শরীরের টক্সিন নির্গমনেও সাহায্য করে। ফলে, মস্তিষ্ক আরও দ্রুত কাজ করতে পারে। আর আমাদের শরীরে সেরোটোনিন বলে একটি হরমোন থাকে, যাকে আমরা হ্যাপি হরমোন বলে থাকি। এই হরমোন বেশি নিঃসৃত হলে, মনও ভাল থাকে। আয়ুর্বেদের থেরাপি এই হ্যাপি হরমোন নিঃসরণ করে।


ছবি সৌজন্যে: হার্টফুলনেস ওয়েলনেস সেন্টার, হায়দরাবাদ

তথ্য সৌজন্যে: হার্টফুলনেস ওয়েলনেস সেন্টার, কানহা শান্তিবনম, হায়দরাবাদ
যোগাযোগ: ৯১৩৩৩১৮৬২৬

ছবি: আইস্টক



মাইক্রোওয়েভ বা অণুতরঙ্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। এমনটাই মনে করেন অনেকে। তাহলে মাইক্রোওয়েভে বানানো খাবারও কি খাওয়া অনুচিত? জানালেন বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান।



ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
নিউট্রিশনিস্ট, ফাউন্ডার-ডিরেক্টর হেলথ টোটাল (মুম্বই, পুণে, নাসিক, বেঙ্গালুরু)। ওবিসিটি ও হেলথ ডিজ়অর্ডার স্পেশ্যালিস্ট। যোগাযোগ: ১৮০০ ২৬৬ ০৬০৭/ ০২২ ৬৭২ ৬৬৮৮৮
আরও জানতে দেখুন www.health-total.com

মাইক্রোওয়েভের খাবার অস্বাস্থ্যকর?

অনেকেই আমায় জিজ্ঞেস করে থাকেন, মাইক্রোওয়েভে বানানো খাবার খাওয়া ঠিক কিনা। এখনকার ব্যস্ত জীবনযাত্রায় মাইক্রোওয়েভ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহজ, নির্ঝঞ্ঝাট, টাইম সেভিং এবং উপকারী একটি গ্যাজেট। চটজলদি রান্না করার এমন সহজ পথ সত্যিই আর দুটো নেই। তবে চিরাচরিত রান্নার ধরন থেকে মাইক্রোওয়েভ যেহেতু আলাদা, তাই অনেকেই মনে করেন, মাইক্রোওয়েভে বানানো বা গরম করা খাবারের পুষ্টিগুণ কম বা শরীরের পক্ষেও তা ভাল নয়। এতে কতটা সত্যতা রয়েছে, সেই নিয়েই আজ আলোচনা করব।

সাবেকি রান্নার পদ্ধতি, যেমন উনুন বা এখনকার গ্যাস-আভেন, সবেতেই আগুনের আঁচ কড়াই বা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে খাবারে প্রবেশ করে রান্না করে। কিন্তু মাইক্রোওয়েভে আগুনের কোনও ব্যবহার নেই। পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের তরঙ্গ, যা মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে ব্যবহৃত তরঙ্গের সঙ্গে অনেকাংশে মেলে। এই তরঙ্গ খাদ্যকণায় প্রবেশ করে তাকে তরঙ্গায়িত করে (সংখ্যায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় কয়েকশো কোটি বার), যা ফ্রিকশনাল হিট বা ঘর্ষণজনিত তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপেই রান্না হয়। এখন প্রশ্ন হল, এতে ক্ষতির আশঙ্কা কোথায়? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় গেলে, আমাদের চারপাশের পরিবেশে প্রচুর তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, যা মূলত টিভি স্ক্রিন, কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিনের মতো গ্যাজেটের তরঙ্গ দ্বারা তৈরি। অনেক গবেষকই মনে করেন, এই তরঙ্গ খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও, প্রতিনিয়ত শরীরের বহুল ক্ষতি করছে। ফলে এই তাপে রান্না হওয়া খাবারও দীর্ঘসময় খেলে তা থেকে জটিল শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

স্বাস্থ্যের আঙ্গিক থেকে বিচার করলে, মাইক্রোওয়েভের ভাইব্রেশন খাবারের পুষ্টিতে প্রভাব ফেলে। মাংস বা দুধের মতো খাদ্যদ্রব্যে কারসিনোজেন তৈরি করতে পারে। তাছাড়া খাবারের ভিটামিন এবং মিনারেলও নষ্ট করে দেয়। আরও সহজ করে বললে, আধুনিক জীবনযাত্রা অনেকক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিন-দিন।

কী করবেন?

একান্তই যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করতে পারেন। তবে সরাসরি তাতে রান্না না করে খাবার গরম করার জন্য মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করুন। মাইক্রোওয়েভ চলাকালীন, তা থেকে অন্তত দু' ফিট দূরত্ব বজায় রাখুন। যতটা সম্ভব, মাইক্রোওয়েভের খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে সত্যিই খাবারে মলিকিউলার পরিবর্তন হয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না-ও হতে পারে।

তবে যদি স্বাস্থ্যই প্রধান প্রায়োরিটি হয়, সেক্ষেত্রে চিরাচরিত রান্নার পদ্ধতিই মেনে চলুন। এতে সময় এবং শ্রম বেশি লাগলেও, স্বাস্থ্যের বাড়তি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারবেন।

ছবি: আইস্টক



পল'স ক্লাউড কিচেন

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

সদ্য চাকরিতে জয়েন করেছিল অদিতি। লাফাতে লাফাতে আমেরিকা থেকে এম এস করে সে দেশেই জবরদস্ত চাকরি পেয়ে গেছে তাই রক্ষে। তার পরেই আচমকা হল লকডাউন। সারাবিশ্বের আর পাঁচটা দেশের মতোই গৃহবন্দি দশা হল তার। কিন্তু মুশকিল হল রেন্টেড হাউজে আরও তিনটি মেয়ের সঙ্গে থাকত সে। তারা কেউ ইন্ডিয়ায় পালিয়েছিল, কেউ বাংলাদেশে, কেউ লন্ডনে। অদিতি ইন্ডিয়ায় যেতে পারেনি নতুন চাকরির কারণে। অতএব সেই লকডাউনে বিস্তর ঝামেলায় পড়ল সে। এবার কী করে? কিছু দূরেই দিদি জামাইবাবু থাকে। কিন্তু সে তো কম সে কম ঘণ্টা চারেকের রাস্তা। গাড়ি কেনেনি অদিতি এখনও। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অসম্ভব। দিদি জামাইবাবু পুলিশের স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে অদিতিকে আনতে গেল।

অতঃপর মাসখানেক লকডাউনের একাকিত্ব কাটিয়ে প্রয়োজনীয় তল্পিতল্পা নিয়ে সে দিদি জামাইবাবুর গাড়ি চড়ে এসে পৌঁছল দিদির অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে এসে তিনজনেরই বাড়ি থেকে কাজের বিস্তর চাপ। ডাবল বেডরুমের দুটি দখল করে দিদি জামাইবাবু আর অদিতি সেই বাড়ির লিভিং রুমে অফিসের কাজ করে। অনলাইন কাজের ধুম সারা বিশ্বে। সৌজন্যে মারণ ভাইরাস কোভিড ১৯। অভ্যেস হয়ে গেছে সবার। তবু তো দিদির বাড়ির একটা ছোট্ট একফালি বারান্দা আছে। অদিতির আগের বাড়িতে তাও ছিল না। দম আটকে আসছিল তার সেখানে। এখানে দিদির বারান্দায় কিছু গাছ আছে। একটা বার্ড ফিড আছে। ভোরে উঠে পাখিদের দানা দিয়ে গাছে জল দিতেও মন্দ লাগে না অদিতির। দিদি জামাইবাবু আছে দুটো কথা বলার জন্য। দিদির কিচেনে দুই

বোনে বেশ জমিয়ে রান্নাবান্নাও করছে। মন ভাল হয়ে যায়। দুই মেয়ে একসঙ্গে থাকায় তাদের মা বাবাও দেশে বসে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন এখন।

ইদানীং দিদির ব্যালকনি থেকে ঠিক চোখ যায় কোনাকুনিভাবে আর-একটি পেন্টহাউজের ছোট্ট একফালি ফায়ার এসকেপের দিকে। সেখানে রোজ চোখ চলে যায় কারণ ছেলেটির চোখে পড়ার মতো মডেল স্বরূপ চেহারা। দাঁড়িয়ে স্মোক করে। ছেলেটিরও চোখ পড়ে অদিতির দিকে। এখনকার মেয়েদের সবটুকুনিই উপস্থিত মেয়েটির মধ্যে। হেয়ার কালার, হেয়ার স্টাইল, স্লিম ফিগারে ঠোঁটের কোণায় একফোঁটা মোনালিসার হাসি।

এগুলো ভাল লাগে হয়তো ছেলেটির। একদিন আলাপ করলে হয়। দেখে বোঝার উপায় নেই কোন দেশীয় সে। কথা না বললে জানার উপায় নেই।

দিদিদের ঝাঁ চকচকে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের পেছনটায় আদিগন্ত গ্রিনারি। বেশ জঙ্গুলে ভরা। মনে হয় ছুটে চলে যেতে। লকডাউনে পথ চেয়েই থাকা। দিদি বলেছে তারা যাবে একদিন। জঙ্গলে পশুপাখির ছবি তুলতে। পশু বলতে হরিণ আর চিপ মাঙ্ক আর নানান রকমের পাখি। সেই আশায় বাঁচে অদিতি। ওয়ার্ক ফ্রম হোমে বোরড হয়ে যায় তারা সবাই।

রোজকার অফিস যাবার তাড়াটা ছিল অন্যরকম। এখন প্রপার ড্রেসিং আপের ঝঞ্ঝাট নেই। বাইরে যাবার ম্যাচিং ছাতা জুতো ছাড়াও লাঞ্চবক্স, ব্যাগ, ফেস টিস্যু, ছোট্ট মেক আপ কিট এসব লাগে না। অদিতির আবার নিখুঁত পরিপাটি এইসবে আর সে ক্যারিও করে ঠিকঠাক। তার স্টাইল স্টেটমেন্ট নজর কাড়া। অনলাইনে শুধু হালকা মেকাপ, ঊর্ধ্বাঙ্গের ফর্ম্যাল পোশাক। হাতের নেল এনামেল, আংটি, বদলে নেওয়া কানের দুল আর ম্যাচ করে গলায় ছোট্ট পেন্ডেন্ট। অবশ্যই চোখের মেক আপ, আইব্রাও আর ঠোঁট রঞ্জনি। চুল তো বটেই। ব্যস! ওটুকুনই দেখা যায় স্ক্রিনে। নীচে তুমি পালাজো, শর্টস কি লেহেঙ্গা দ্যাট ডাজ়ন্ট ম্যাটার। তবে অদিতি এতটাই সাজ সচেতন যে ম্যাচ করে লিপস্টিক কিংবা নেল এনামেল মাস্ট।

দিদি অনিতার আবার ভ্রূক্ষেপ নেই সাজগোজে। ইন্সটাগ্রামে ক্রমাগত পাউট করা ছবির পোস্ট দেখেই সে বোনকে বরং মোটিভেট করে এদেশে নিয়ে এসেছিল। একটা কর্পোরেট কেরিয়ার গড়তে বাধ্য করেছে নয়তো সে মেয়েকে নিয়ে মা বাবার চিন্তার শেষ ছিল না। অদিতির ইচ্ছে ছিল মডেলিং। তবে বিদেশে এসে লাইফ স্টাইলের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে অদিতি আপাতত সেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তবে সাজগোজ বজায় আছে ঠিকই।

লকডাউনে অদিতির মন ভাল থাকে এতে। শুনছিল এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে করতে প্রচুর ছেলেমেয়ের অ্যাকিউট ডিপ্রেশনে। শালির সাজুগুজু দেখে কুণাল বউকেও বলেছে তুমি তো কুর্তিটাও বদল করতে পার! আলমারি ঠাসা ড্রেস তোমার! অনিতা বলে, কী হবে এসবে?

সত্যি জীবনটা কেমন স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে গেল সবার! উইকেন্ড-এর সেই মাদকতা নেই। ফ্রাইডে ইভনিং এলেই সকাল থেকে মন উচাটন নেই। অফিসের ট্যুর প্ল্যানিং নেই। হলিডে ট্রিপের উত্তেজনা নেই। শুধু রাঁধার পরে মুখরোচক খাওয়া আর ফাঁকে ফাঁকে অনলাইন অফিসের কন কল, ওয়েবিনার, মিটিং।

ভাল্লাগেনা বললে চলবে? তবু তো চাকরিগুলো বজায় আছে এই রিসেশনের যুগে। কোভিডের জমানায় সেটাই যথেষ্ট। কুণাল বলে।

ভিডিও কনফারেন্সিং চলাকালীন মনে পড়ে যায় অদিতির। রান্নাঘরে দিদির ফ্রিজ থেকে কি যেন একটা "থ" করার কথা। দিদি সিনিয়র ম্যানেজার। তার দায়িত্ব অনেক বেশি। অদিতি ভুলে গেলেই কেস। দিদি তার নিজের ব্রেকে চট করে বানাতে পারবে না। দুই বোনের লাঞ্চ ব্রেকের টাইম আলাদা। উইক ডে থাকলে ওয়ান পট পাস্তা বা নুডলস কিংবা ব্রেড আর মাংসের কিমা দিয়ে ফ্রেঞ্চ ক্যাসারোল। বৃষ্টি পড়লে অবশ্য অনিতাকে ইনস্ট্যান্ট পটে টাইমার দিয়ে খিচুড়ি বসাতেই হয় কুণালের আবদারে। অমলেট পাঁপড় এসব দেখাশোনা করে অদিতি। দিদি জামাইবাবু অনলাইন মিটিং সেরেই সেদিন বসে পড়ে ডাইনিং টেবিলে। ফ্রিজে পড়ে থাকা মায়ের বানানো আমের চাটনিটা শেষপাতে। অদিতি গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দেয় সবার পাতে।

টেবিল সাজানো দেখে কুণাল শালির তারিফ করে। বুঝলে এবার পাত্র দেখতে হবে আমাদের। শুনে অদিতি হাসে।

অনিতা বলে, তার আবার যেমন তেমন পাত্র পছন্দ হলে হয়। সুদর্শন হতে হবে, কী রে তাই তো?

অদিতি বলে, হোয়াট? আমি একবারও বলেছি?

মশকরা করে দিদি বলে, দেখ তুই একদা মডেল হবি বলে পণ করেছিলি। তার মানে তোর মনের কোনায় থিতিয়ে পড়া ইচ্ছেটা...

তুই যেন সব জেনে বুঝে আছিস দিদি! অদিতি বলে।

খাওয়ার টাইম ফুরোয়। গল্প আড্ডায় ইতি টেনে যে যার ল্যাপটপের সামনে চলে যায়। যাবার আগে অনিতা তার আটপৌরে ক্রকারি, কাটলারি ভরে দেয় ডিশ ওয়াশারে।

অদিতির কিছু পরে আবার অনলাইন অফিসে যোগদান। দিদিরা বসে পড়ে নিজেদের ঘরে যে যার মতো। অদিতি মশলার ডিবে থেকে মৌরি নিয়ে একটু আয়েস করে। সেই একফালি বারান্দায় বার্ড ফিডে দানা কমে গেছে কিনা পরখ করতে গিয়েই সেদিন চার চোখ এক হয়ে যায়। কোণাকুণি সেই ফায়ার এসকেপের ন্যানো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে। মেয়েরা বুঝতে পারে ছেলেদের চাহনি। এ ব্যাপারে মেয়েরা তুখোড়। কিছু বলতে চায় ছেলেটি। অদিতিই শুরু করে।

ইউ স্মোক ফ্রিকোয়েন্টলি।

নট টু মাচ। ডোন্ট ইউ?

নট অ্যাট অল!

বাট ডু ইউ নো? ওয়ান অফ দ্য সুপার অ্যান্টিডোটস অফ দিস ভাইরাস ইজ় ট্যোব্যাকো।

হা হা হা ...দেন সামবডি উইল সে ইথাইল ইজ় গুড ফর করোনা।

আপনি বাঙালি? সেই যুবক হঠাৎ বলেই ফেলে।

হ্যাঁ, মানে আপনিও? বুঝলেন কীভাবে?

ইথাইল ফিথাইল এসব বাঙালিরাই ঝাড়ে তাই... আসলে আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট।

তো? আমিও তাই। তা এখানে কী করা হয়?

চাকরি পেয়েছি সবে। তারপরেই লকডাউন, দিদির বাড়ি থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আপনি?

বেসিক্যালি ভ্যাগাবন্ড। চাকরি চলে গেল সদ্য এই লকডাউনে। জবাব দিল কোম্পানি। হাইফাই কিছুই নই তবে প্যারালালি নিজের প্যাশনটা টিকিয়ে রেখেছিলাম তাই একটু আধটু পয়সা কড়ি পাচ্ছি তাই ভাঙিয়ে।

তা কী সেই নেশা যা বর্তমানে পেশায় পরিণত?

রান্না। তা থেকে অনলাইন কিচেন ব্লগ... এখানে এসে খুব বোরড হতাম প্রথম দিকে। তারপর অনলাইন ফুড কলাম লিখতাম নিয়মিত ...সেই থেকেই কানেকশন... এখানকার একটা বিশাল ফুড চেনের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ কুকারি শো-তে

ইনভাইটেড শেফ হয়ে বেঁচে বর্তে আছি আর কী! লকডাউন খুললেই দেশে পালাব।

আরিব্বাস! তাহলে তো আপনার রান্না খেতেই হচ্ছে।

কিন্তু এখন সে উপায় নেই। আই মিন নো ওয়ে।

সেল নম্বর দিন। ফেসবুকের লিঙ্ক দিন, আপনার লাইভ কুকারি শো দেখব।

বাই দ্য ওয়ে, আপনার নাম?

এখানে সবাই আদিতি বলে ওদের অ্যাকসেন্টে। আপনি?

রণিত পাল। এখানে সবাই পল বলে ডাকে। ইনফ্যাক্ট পল'স কিচেন দিয়ে সার্চ করলেই আমার রেসিপি দেখতে পাবেন ইন্টারনেট জুড়ে।

কী রে? কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই? অনিতা পেছনে এসে দাঁড়ায়।

আরে দিদি, দেখ, তোরা সেলেব্রিটি শেফের পড়শি।

তাই?

জানিস না? অ্যাদ্দিন এখানে আছিস?

হাই! অনিতা হাত নাড়ে।

অদিতির চোখ সেই ছেলের দিকে দেখে দিদি ফুট কেটে বলল, আই উইশ ইফ উই কুড হ্যাভ ইউ ওভার ...বাট অ্যাজ় ইউ নো ...

অদিতি হেসে বলল, লেটস প্রে ফর সাচ আ ওয়ান্ডারফুল উইকেন্ড!

এবার হাত নেড়ে যে যার মতো ঘরে ঢুকে পড়ে।

অদিতি ব্লাশ করছে দেখে অনিতা ঘরে ঢুকেই বোনকে বলল, কী রে? মনে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে?

অদিতি বলল, কথা বলার লোক নেই একটাও, কী আর করি? তুই শুধু সন্দেহ করে যা সারাজীবন। মাকে জানিয়ে দে এবার তবে।

অনিতার মনে পড়ে গেল কলেজ যাবার দিনগুলো। বাসে উঠেই বোন সবাইকে খুব ভিভিডলি ওয়াচ করত। বিশেষ করে কোন ছেলের কী পোশাক, কী পরা উচিত ছিল। কে বেশ লাল্টুপুল্টু মার্কা, তার নাম দিত মাখন। যেগুলো বেশ মেনিমুখো সেগুলো ম্যান্তা এমন সব।

অনিতা বলল, তুই গ্রিন সিগনাল দিলেই জানাব মাকে। আফটার অল বোথ অফ ইউ আর কোয়াইট এলিজিবল ফর ম্যারেজ। কী করে রে ছেলেটি?

অদিতি বলল, আপাতত লকডাউনে স্যাকড। দেশে ফিরে রেস্তরাঁ খুলবে।

এই বাজারে রেস্তরাঁ? পাগল নাকি সে? অনিতা বলে ওঠে।

অদিতি বলল, নিজের চাকরিটা আছে বলে বুঝছিস না।

এখানে তো খুব নামডাক হয়েছে বললি। তাহলে দেশে কেন পাততাড়ি গোটাচ্ছে?

অদিতি বলল, আমায় অতশত বলেনি রে। ফোন নাম্বার চাইব। বরং তুই জিগ্যেস কর।

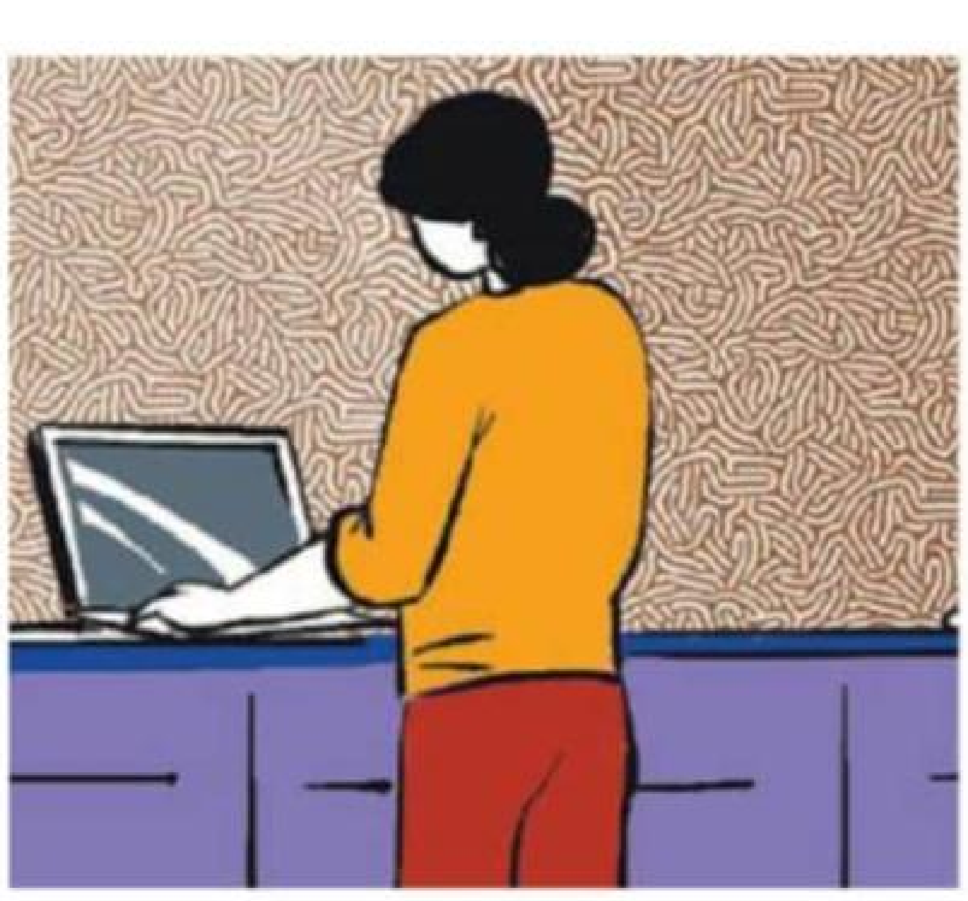
এসবের পর রোজ রোজ দিব্য চলতে লাগল দিদির বারান্দা থেকে তেরচা ফায়ার এস্কেপের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ধূমপানরত রণিতের সঙ্গে অদিতির খুচরো সংলাপ। কনে দেখা আলোয় আরও উজ্জ্বল দেখায় অদিতিকে। ঠিক বিয়ের ফুল ফুটলে যেমন হয় আর কী।

কিছুদিন পর...

অদিতিই ভরসা দিয়েছে রণিতকে। আপাতত কেউই দেশে ফিরছে না তারা। হোম ডেলিভারি রমরমিয়ে চলছে দেশের মতো বিদেশেও। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে করতে থকে যাওয়া টেকিরা হোম ডেলিভারিতেই অভ্যস্ত হয়েছে। অদিতি বুদ্ধি দিয়েছে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে। ক্লাউড কিচেন বানিয়েছে রণিতের জন্য। দুই বাড়িতেই এখন রান্নার জোগাড় চলে। যে যেমন অর্ডার দেয় সেই অনুযায়ী অনলাইন বাজার এসে যায় কিছুদিন পরে। নিজেদের খানাপিনাও তৈরি হয়ে যায় সেইসঙ্গে।

ইন্ডিয়ান ফুড দিয়ে সার্চ করলেই ইউএসএ-র পল'স কিচেন খুব জনপ্রিয় এখন। তবে পুরোটাই আছে ক্লাউডে। অর্ডার নেওয়া থেকে ডেলিভারি সবটাই। অবশ্য ডেলিভারি বয় রেখেছে তারা। মোটরসাইকেল রেখে স্যানিটাইজ় করে, মাস্ক, গ্লাভস পরে দোসা, ইডলি থেকে কুলচা-আলুর দম সব নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। এখানকার মেমসাহেবরাও চেটেপুটে খায় ইন্ডিয়ান ফুড। পল'স কিচেনের রেটিং খুব হাই খাবারের গুণমান আর পরিচ্ছন্নতার কারণে। রেস্তরাঁ গড়ার ওভারহেড কস্ট নেই।

এসবের পর রোজ রোজ দিব্য চলতে লাগল দিদির বারান্দা থেকে তেরচা ফায়ার এস্কেপের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ধূমপানরত রণিতের সঙ্গে অদিতির খুচরো সংলাপ। কনে দেখা আলোয় আরও উজ্জ্বল অদিতি।



অনিতা সেদিনই কুণালকে বলছিল, আমাদের পাড়ার সেই শম্পাজ় হেঁশেল? সেই তিমিরেই পড়ে রইল। আর দেখ, এই রণিত-অদিতি মিলে দূর থেকে কেল্লা ফতে করে দিল!

কুণাল বলল, সব তো ভাল, কিন্তু লকডাউন মিটলেই চারহাত এক করতে হবে। বড় কষ্ট বেচারাদের।

অদিতি সেই শুনে ফিক করে হেসে পাশের ঘর থেকে বলল, কুণালদা? কোভিড, কোভিড! গড ফরবিড!

অনিতা বলল, তো কী? ভয় পেলে চলবে? দেখছিস না বাইরে সব খুল্লমখুল্লা? তোদের যত্তসব! নীচে একটা অ্যাপার্টমেন্ট খালি পড়ে আছে। কথা বলেছি বাড়িউলির সঙ্গে। রণিত এসে সাতদিন ওখানেই না-হয় থাকবে ওর ল্যাপটপ আর রন্ধন সামগ্রী নিয়ে। বাকিটা সামলে নিবি তুই। সাতদিন পর ফেস কভার পরেই না হয় ওপরে উঠে ডিস্কভার করবে আমার বোনকে সামনাসামনি। সেদিনই বিয়ে দেব আমরা উইদাউট বরযাত্রী।

কুণালদা বলল, আর বিয়েবাড়ির ফুড কিন্তু পলস কিচেন থেকে নয়। আমি রাঁধব সেদিন চারজনের ল্যাম বিরিয়ানি।

হঠাৎ বারান্দার পাখিগুলো খুশিতে কিচিরমিচির করে উঠল। আজকাল একটু বেশিই খাবার পাচ্ছে ওরা অদিতি এ বাড়িতে আসার পর থেকে।

অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল

বোল্ড অ্যান্ড ব্রাইট

পোশাকে উজ্জ্বল রং বা বোল্ড প্রিন্ট থাকলে তার স্টাইলিং নিয়ে আরও সতর্ক থাকুন। না হলে খুব সহজেই উগ্র দেখাতে পারে এই ধরনের পোশাকে। জমকালো পোশাক টোন-ডাউন করার পরামর্শ।



Dazzling Dresses

উজ্জ্বল রঙের লং ড্রেস বা মিডি ড্রেসের সঙ্গে অন্য কিছু টিম-আপ করা কঠিন। ফলে এই ধরনের পোশাক টোন-ডাউন করতে নিউট্রাল রঙের শ্রাগ নিতে পারেন। তবে সবক্ষেত্রে যে এই রুল প্রয়োগ করতে পারবেন, তা নয়। সব ড্রেসের সঙ্গে শ্রাগ মানানসই নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু ছোট ছোট ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে পারেন। যদি বেল্ট টিম-আপ করা সম্ভব হয়, তাহলে চওড়া নিউট্রাল রঙের বেল্ট পরুন। অ্যাকসেসরিজ় যত ক্ল্যাসিক হবে, তত ভাল। যেমন ফুল ব্ল্যাক সানগ্লাস পরতে পারেন, বা নুড কিংবা সাদা হিলস পরতে পারেন। গয়না না পরলেই ভাল। একান্তই পরতে হলে স্টাডস আর স্লিক চেনের মধ্যে সীমিত থাকুন। জুতোর ক্ষেত্রে রঙের বাহুল্য না রেখে শেপ এবং কাট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন, যাতে ড্রেসের থেকে নজর খানিকটা হলেও জুতোর দিকে ঘোরানো যায়।



Beaming Bags

ব্যাগে উজ্জ্বল রং বা কালারফুল প্রিন্টস থাকলে, তা যে কোনও আউটফিটের সঙ্গে ক্যারি করার ভুল করবেন না মোটেই! এক্ষেত্রে দু'টো রুলের যে কোনও একটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। হয় একেবারে নিউডট্রাল বা সিম্পল কাট এবং কালারের আউটফিটসের সঙ্গে এই ধরনের ব্যাগ নিন। অথবা ব্যাগে যে রঙের আধিপত্য রয়েছে, পোশাকেও সেই রঙের আধিপত্য রাখুন।




Vivid Pants

সাজগোজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে বোল্ড রং, প্রিন্ট বা প্যাটার্ন রয়েছে, এমন ট্রাউজ়ার্স বেছে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে টপে কনট্রাস্ট রাখতে পারেন। অর্থাৎ, সলিড রঙের ট্রাউজ়ার্সের সঙ্গে অন্য উজ্জ্বল এবং সলিড রঙের টপ টিম-আপ করতে পারেন। আর প্রিন্টেড প্যান্টস হলে হালকা বা গাঢ় নিউট্রাল রঙের টপ বেছে নিন।



Blazing Blazer

নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করার খুব সহজ এবং নিরাপদ অপশন ব্লেজ়ার। কালারফুল ব্লেজ়ার যে কোনও বোরিং আউটফিটকে স্পাইস-আপ করার মোক্ষম অস্ত্র! যেমন, ফর্ম্যাল টপ আর বটমসের উপর উজ্জ্বল রঙের ব্লেজ়ার চাপিয়ে নিলেই তা পার্টি আউটফিট হয়ে উঠতে পারে। আবার ডেনিম আর টি-র ক্ল্যাসিক কম্বিনেশনও ব্রাইট ব্লেজ়ারের সঙ্গতে হয়ে উঠতে পারে চূড়ান্ত ফ্যাশনেবল।



দুই বাংলার হেঁশেল থেকে...

স্বাদে-সুঘ্রাণে অনবদ্য ইলিশের এক-একটি বাংলাদেশি পরিবেশন। কম যায় না এপার বাংলাও। ইলিশের পাঁচটি পদ সাজিয়ে দিলেন শেফ ভাস্কর দাশগুপ্ত। 'সানন্দা'র জন্মদিনে একটু ইলিশ-বিলাস হয়ে যাক! সংকলনে মধুরিমা সিংহ রায়।

ইলিশের সঙ্গে বাঙালি মনের মিল অনেকটা পরদায় উত্তম-সুচিত্রার জুটির মতো। একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে ভাবাই যায় না... এমন কোনও বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, বর্ষাকাল এলেই যাঁর মনটা ইলিশ-ইলিশ করে না! এব্যাপারে ওপার-এপার বাংলার বিস্তর মিল। রন্ধনপ্রণালীতে, উপকরণে তারতম্য থাকতেই পারে। কিন্তু ভালবাসার জায়গাটা একই। ইলিশ নিয়ে দুই বাংলাই একইরকম আবেগে ভাসতে পারে। তা সে যতই চিংড়ি নিয়ে ঘটিদের গর্ব থাক না কেন, পাতে ইলিশ দেখলে তার খাদ্যরসিক মন একটুও দুর্বল হবে না, হতেই পারে না! তবে পদ্মার ইলিশের স্বাদ আর ইলিশের বাংলাদেশি রন্ধনপ্রণালী প্রায় কাল্ট স্টেটাস পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এপার বাংলার রন্ধনপটীয়সীরাও তো কম যান না। দুই বাংলাতেই তাই ইলিশ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জন্মদিন উপলক্ষে জমিয়ে খাওয়াদাওয়ার আসরে তাই বাংলাদেশি ইলিশ রান্নাকে বাদ দেওয়া গেল না..

আম তেল ইলিশ লাউপাতা ভাতে

উপকরণ: ইলিশ ১০০ গ্রাম, লাউপাতা ৬০ গ্রাম, সেদ্ধ করে রাখা ভাত ১০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাবাটা ১০ গ্রাম, রসুনবাটা ২০ গ্রাম, সরষের তেল ২০ মিলি, সরষেবাটা ২০ গ্রাম, নারকেলবাটা ১০ গ্রাম, আমতেল ৩০ গ্রাম, কাঁচা আম (কুচনো) ২০ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো ১০ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম।

প্রণালী: ইলিশে নুন-হলুদ মাখিয়ে দশ মিনিট রাখুন। একটি পাত্রে লাউপাতায় সামান্য নুন মাখিয়ে দশ মিনিট রাখুন। তারপর জল দিয়ে পাতাগুলো ধুয়ে হালকা নিংড়ে নিন যাতে নুন বেরিয়ে যায়। এবার একটি পাত্রে লাউপাতা, ইলিশ ও ভাত বাদে বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। এই মশলার মিশ্রণে মাছ ম্যারিনেট করে নিন ২০ মিনিট। লাউপাতার মাঝখানে ম্যারিনেট করে রাখা মাছ দিয়ে পার্সেলের মতো করে মুড়ে দিন। পালিশবিহীন





আম তেল ইলিশ লাউপাতা ভাতে



কাঁচালঙ্কা ইলিশ

কাঁসার বাসনে সেদ্ধ করে রাখা ভাতের অর্ধেকটা রেখে তার উপর পাতায় মোড়া ইলিশ রাখুন। বাকি ভাত উপর থেকে দিয়ে দিন। পাত্রটির মুখ বন্ধ করে স্টিমারে বসিয়ে ২৫ মিনিট মতো রান্না করুন। হয়ে গেলে পাতার মোড়ক থেকে মাছ বের করে সুন্দর করে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। লাঞ্চ বা ডিনারে জমে যাবে।

কাঁচালঙ্কা ইলিশ

উপকরণ: ইলিশ ৫০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাকুচি ১০ গ্রাম, ধনেপাতাকুচি ১০০ গ্রাম, পুদিনাপাতাকুচি ২০ গ্রাম, কালোজিরে স্বাদমতো, সরষের তেল ৫০ মিলি, হলুদগুঁড়ো-নুন স্বাদমতো, লেবুর রস ২০ মিলি, লেমন জ়েস্ট সামান্য, জল ২০ মিলি।

প্রণালী: লেবুর রস, লেমন জ়েস্ট, নুন ও হলুদ দিয়ে মাছ ম্যারিনেট করে নিন। প্যানে তেল গরম করে ইলিশ শ্যালো ফ্রাই করে নিন। কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, পুদিনা একসঙ্গে মিশিয়ে সামান্য জল দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মাছভাজার তেলেই কালোজিরে ফোড়ন দিন। নুন, হলুদ ও জল দিন সামান্য। পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে মাছ দিন। মিনিট তিনেক ফুটিয়ে সবুজ মিশ্রণটি দিন। আরও এক মিনিট ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করুন। আঁচ থেকে নামিয়ে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। উপর থেকে লেবুর রস, কাঁচা তেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।



ইলিশের ল্যাজার ভর্তা

মাওয়া ঘাটের ইলিশ ল্যাজার ভর্তা

উপকরণ: ইলিশের ল্যাজা ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩০০ গ্রাম (কুচনো), কাঁচালঙ্কাকুচি ১৫ গ্রাম, ধনেপাতাকুচি ১৫ গ্রাম, লেবুর রস ১৫ মিলি, গোটা শুকনোলঙ্কা ১৫ গ্রাম, সরষের তেল ৬০ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো সামান্য, হলুদগুঁড়ো পরিমাণমতো।

প্রণালী: মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে হলুদ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ও নুন মাখিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। প্যানে তেল গরম করে মাছ মুচমুচে



পানিখোলা ইলিশ

করে ভেজে তুলুন। প্যান থেকে নামিয়ে মাছ ঠান্ডা করে কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। প্যানে শুকনো খোলায় গোটা শুকনোলঙ্কা রোস্ট করে নিন। সুগন্ধ বেরলে প্যান থেকে নামিয়ে গুঁড়ো করে নিন। একটি পাত্রে পেঁয়াজকুচির সঙ্গে রোস্টেড শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ও সামান্য নুন মিশিয়ে নিন। পেঁয়াজ জল ছাড়তে শুরু করলে লেবুর রস দিন। এবার এই মিশ্রণে কাঁটা ছাড়ানো মাছ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। এতে একে একে কাঁচালঙ্কাকুচি, ধনেপাতাকুচি, ১ টেবলচামচ কাঁচাতেল ও প্যানে মাছ ভাজার পর বাকি থাকা তেল ঢেলে দিন। সব মিশিয়ে নিলেই ভর্তা তৈরি।

পানিখোলা ইলিশ / বরিশালের সাদা ইলিশ

উপকরণ: ইলিশ ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২০০ গ্রাম, আদার রস সামান্য, কাঁচালঙ্কা ২০ গ্রাম, সরষের তেল ৫০ মিলি, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: মাছ ভাল করে ধুয়ে অল্প নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে নিন ১৫ মিনিট মতো। প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। স্বচ্ছ রং ধরলে তাতে আদার রস দিয়ে মিনিটখানেক নেড়েচেড়ে নিন। তেল ছাড়তে শুরু করলে অল্প জল দিয়ে মশলা কষিয়ে তাতে ইলিশ, কাঁচালঙ্কা ও নুন দিয়ে ১৫ মিনিট মতো ফুটিয়ে নিন। একটু পাতলা গ্রেভি হয়ে এলে ও উপরে তেল ভাসতে শুরু করলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ইলিশ-বেগুনের টক

উপকরণ: ইলিশের ল্যাজা ৩৫০ গ্রাম, বেগুন ১০০ গ্রাম, তেঁতুল ৩০ গ্রাম, সরষের তেল ১৫ মিলি, শুকনোলঙ্কা ৫ গ্রাম, গোটা সরষে ১৫ গ্রাম, গুড় ১০ গ্রাম, নুন ও হলুদগুঁড়ো পরিমাণমতো।

প্রণালী: ইলিশে নুন-হলুদ মাখিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। বেগুন ভেজে রাখুন। তলা-ভারী পাত্রে তেল গরম করে নিন। আঁচ কমিয়ে মাছের দু'পিঠ ভেজে তুলে নিন। ওই প্যানেই গোটা সরষে আর শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন।



ইলিশ-বেগুনের টক



ফোড়ন ফাটতে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে অল্প নুন-হলুদ দিয়ে মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। বেগুন নরম হয়ে এলে জলে গুলে রাখা তেঁতুল দিন। ফুটিয়ে নিন। এবার মাছের টুকরো দিন। নুন-চিনি দিন পরিমাণমতো যাতে তেঁতুলের টকের সঙ্গে স্বাদের ভারসাম্য আসে। কষতে থাকুন যতক্ষণ না গ্রেভি একটু ঘন হয়ে আসে। হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম ভাতের পাতে পরিবেশন করুন এদেশীয় এই পদ।

সহজ কিছু উপাদান দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন এই পদগুলো। বর্ষা হোক না হোক, পাতে ইলিশ হওয়া চাই...

রেসিপি সৌজন্যে: সোনার তরী
যোগাযোগ: ৯৮৭৪৫১৭০০০

ছবি: শুভেন্দু চাকী



ভালবাসি নিজেকে...

নিজে ভাল থাকার জন্য, চারপাশের মানুষগুলোকে ভাল রাখার জন্য নিজেকে ভালবাসুন। লেখিকা থেকে কলেজ পড়ুয়া এমনি কয়েকজনকে নিয়ে বিশেষ ফ্যাশন ফিচার।



“

সুস্মেলী দত্ত

লেখিকা

আমি সব কিছুর মধ্যে পজ়িটিভ দিকটা দেখার চেষ্টা করি। ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা থেকে অনেক সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা যায়। ভাল থাকার মূল মন্ত্র, জীবন যেদিকে যে গতিতে যাচ্ছে, সেই স্রোতে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। ভাল-মন্দ সব রকম সময়ই জীবনে আসে, কিন্তু সব সময় শুধু খারাপ দিকটা নিয়ে চিন্তা করি না। সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। সাজতে ভালবাসি। নিজেকে দেখতে ভাল লাগলে মনও ভাল থাকে। এবং নিজে ভাল ভাল থাকলে চারপাশের মানুষগুলোকেও ভাল রাখা যায়।

”

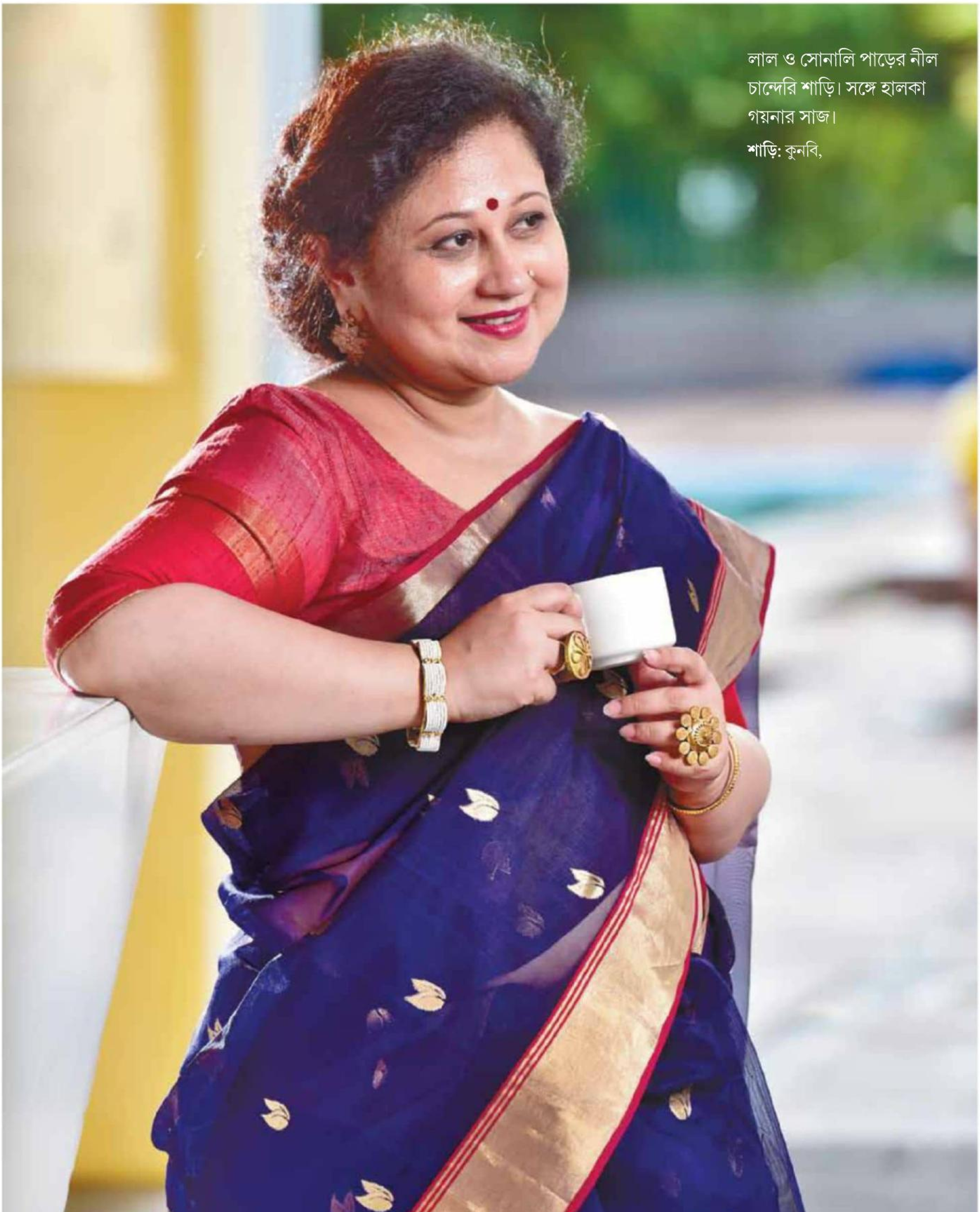
(বাঁ দিকের পাতা) সিগ্রিন স্লিভলেস টপ, সঙ্গে পালাজ়ো। ইন্দো ওয়েস্টার্ন সাজে ফুরফুরে মেজাজে।

পোশাক: সাস্যা

ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

বেজ তসর ফ্যাব্রিকের উপর এমব্রয়ডরি কাজ করা এথনিক কামিজ়।

পোশাক: সাস্যা



লাল ও সোনালি পাড়ের নীল চান্দেরি শাড়ি। সঙ্গে হালকা গয়নার সাজ।

শাড়ি: কুনবি,

“

দেবীশ্রী দত্ত
স্টুডেন্ট

সেল্ফ লাভের বলতে নিজের কাছে কমফর্টেবল থাকাটা খুব দরকার। ভাল থাকতে হলে সুস্থ থাকাটা জরুরি। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার খান, ডায়েটও করা যায়। নিজের কাছে নিজেকে সুন্দর রাখতে হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সবসময় আত্মবিশ্বাসের নিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা করি। এইভাবেই আমি নিজেকে ভালবাসি, ভাল রাখি।

”



লাল প্রিন্টেড লং টপ। সঙ্গে অ্যাসিমেট্রিকাল কাটের লং জ্যাকেট।

পোশাক: অরণ্য
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩ ৬০১১



ম্যাজেন্টা তসর শাড়ি। বাদিকে অন্যজন পরেছেন হলুদ কটন লং কুর্তি। সঙ্গে কিউলোটস প্যান্টস ও দোপাট্টা।

শাড়ি: কুনবি
ফোন: ৯১৬৩৪৫৫৫০০
কুর্তি ও প্যান্টস: অরণ্য

অনসূয়া সেন

স্টুডেন্ট

“নিজেকে ভাল রাখার জন্য, ভাল থাকার জন্য নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা খুব প্রয়োজন। আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনও কঠিন কাজ খুব সহজেই করা যায়। জীবনের যেকোনও মুহূর্তে আপনি সমালোচনা বা খারাপ মন্তব্যের মুখোমুখি হতে পারেন। কিন্তু সমালোচনাকে পজ়িটিভলি নিতে হবে। তাহলে হয়তো অনেক কঠিন পরিস্থিতিও সহজ হয়ে যাবে। এর জন্য নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং নিজেকে মোটিভেট করাটা খুব জরুরি। তাই নিজেকে ভালবাসুন, ভাল থাকুন।”

ফ্যাশন শুট দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
রুপোর গয়না:
করিশ্মাজ়, গোলপার্ক
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা
ছবি: শুভদীপ ধর
পরিকল্পনা ও রূপায়ণ: মৌমিতা সরকার, মধুরিমা সিংহ রায়



মিষ্টি নিয়ে সাহিত্য উৎসব

কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে এক অভিনব তিনদিনব্যাপী মিষ্টির সাহিত্য উৎসব! ডিসেম্বরে আয়োজিত হতে চলা এই উৎসবে হাজির থাকবেন দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা। মিষ্টি নিয়ে এহেন সাহিত্যচর্চার সমাবেশ বেশ নতুন এক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। সেই উৎসবেরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। শহরের এক হেরিটেজ বুটিক পেন্টহাউজে তারকাখচিত সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুনমুন সেন, রাইমা সেন, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মধু নেওটিয়া, রুবি পালচৌধুরী, অনুপম রায়, অনীক দত্ত, অরিন্দম শীল, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকে।

গুণীজন সম্মাননা

সম্প্রতি কলকাতার এক জনপ্রিয় অডিটোরিয়ামে গুণীজনদের সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। খেলা, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যের বিভিন্ন গুণী



মানুষকে সম্মান জানানো হল। শঙ্কর, সুব্রত ভট্টাচার্য, চৈতালি দাশগুপ্ত, শাশ্বতী গুহঠাকুরতা, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, দেবশ্রী রায়, পূর্ণদাস বাউল-সহ একাধিক ব্যক্তিত্বের হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন আরও অনেকেই।



গয়নাপ্রেমীদের জন্য সুখবর

দেশের প্রথম সারির একটি গয়না প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড রথযাত্রার দিন উদ্বোধন করল কলকাতায় তাদের দু'টি নতুন স্ট্যান্ড অ্যালোন শোরুমের। দু'টিরই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ-অভিনেত্রী নুসরত জাহান। সোনা, হিরে বা বহুমূল্য স্টোনের উপর অভিনব ডিজ়াইনের ট্রেন্ডি গয়না ক্রেতাদের মুখে হাসি ফোটাবে, সেটাই স্বাভাবিক। আংটি, নেকপিস, ইয়ারিং, ব্রেসলেট-সহ অসংখ্য কালেকশন রয়েছে স্টোরদু'টিতে। গয়নাগুলোর ডিজ়াইন ভাবা হয়েছে আধুনিক মহিলাদের কথা মাথায় রেখে। গয়না নুসরতেরও বেশ প্রিয়। শোরুম উদ্বোধনে এসে তিনি জানালেন সেকথাও।

পোশাকের নতুন ঠিকানা

সম্প্রতি 'বহুরূপী শান্তিনেকেতন' লঞ্চ করল তাদের নতুন স্টোর, নতুন ঠিকানায়। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। ফ্যাশন ডিজ়াইনার অভিষেক রায় সাবেকিয়ানা সাজে সাজিয়েছেন তাঁর এই স্টোর। এথনিক, ওয়েস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন পোশাকের সম্ভার। সেলিব্রিটি অতিথিদের উপস্থিতিতে জমজমাট ছিল অনুষ্ঠান।





নতুন ছবি

সম্প্রতি মুক্তি পেল ইশা সাহা, অনুভব কাঞ্জিলাল অভিনীত, অঞ্জন কাঞ্জিলাল পরিচালিত ছবি 'সহবাসে'। ছবির প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলীরা। দর্শকের খুবই প্রশংসা পেয়েছে এই ছবি। ইতিমধ্যেই ছবির গান শ্রোতাদের মন জয় করেছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা দুই শিক্ষিত ছেলেমেয়ের একসঙ্গে থাকার গল্প নিয়ে এই ছবি।

ভারতের ‘মধ্যমূল’

উজ্জয়িনীকে ভারতের নাভিকুণ্ড বললে বোধহয় খুব অত্যুক্তি হয় না! পুরাণ ও ইতিহাসের জীবন্ত প্রতীক এই শহর দেখে এলেন ধ্রুব মুখোপাধ্যায়।



অখণ্ড ভারতকে লম্বালম্বিভাবে দু’ভাগে ভাগ করলেই ভারতের শক্তিপীঠ আর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গগুলোও মোটামুটি দু’পাশে আলাদা হয়ে যায়। একটা আস্ত দেশ যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রকৃতি আর পুরুষের সমন্বয়ের তত্ত্বকে বুকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে। বুক চিতিয়ে বহন করে চলেছে নারী এবং পুরুষের দর্শন। আর সেই সমন্বয়ের তত্ত্বেরই যদি আধার খুঁজতে হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে না গিয়ে উপায় নেই। মধ্যপ্রদেশ যদি ভারতের মধ্য প্রদেশ হয় তাহলে উজ্জয়িনী অবশ্যই ভারতের নাভিকুণ্ড। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম, মহাকালেশ্বর (একমাত্র দক্ষিণমুখী জ্যোতির্লিঙ্গ) আর বাহান্ন সতীপীঠের অন্যতম মা হরসিদ্ধিপুরি এই একই জায়গায়। এখানে মায়ের কনুই পড়েছিল। আর আর সেই নেশাতেই রাত বারোটায় কলকাতা থেকে ফ্লাইটে উড়ে সোজা



মন্দিরের শহর...



গিয়ে নামলাম ইনদওরে। গরম আর ঠান্ডার হিসাবে মধ্যপ্রদেশকে কিছুটা চরমপন্থী বলেই মনে হয়। আর সে জন্যই জানুয়ারি মাসের শেষের দিকটাকেই বেছে নিয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে রাতের প্লেনে চড়ে হায়দরাবাদ হয়ে কানেক্টিং ফ্লাইটে ইনদওরে যখন পৌঁছালাম তখন ভোররাত। সেই ভোরের আলোছায়াতেই ভাড়ার গাড়িতে মোটামুটি দেড়ঘণ্টায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরের সামনে। ভারতের মন্দিরগুলোর মতো এখানেও সকাল হয় অনেক ভোরে। কিছুটা ভোররাতও বলা যায়। ভোররাতে হওয়া মহাকালেশ্বরের ভস্মাহুতি দেখে বেরনো লোকেদের ভিড়েই চোখে পড়ল, এক অদ্ভুত সাধু। অঘোরী। 'জয় শ্রী মহাকাল' লেখা কালো চাদরে ঢাকা শরীরের পিছনের অংশ, মাথায় রুদ্রাক্ষের একটা মালা পাক খাইয়ে বাঁধা আর তাতেই মুকুটের মতো করে চারপাশে গোঁজা বেশ কিছু ফুল। গাঢ় করে গোলা ভস্মমাখানো জলে স্নান করেছেন যেন। সেই ভস্ম শুকিয়ে কাঠ হয়ে লেগে আছে চোখেমুখে, দাড়িতে। প্রণাম করতেই শরীরের শুকনো ভস্মের কিছুটা হাতে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন। কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও আমার মত পিপিএফ, মিউচুয়াল ফান্ড আর ভবিষ্যৎকে আরও আরও সুরক্ষিত করার পরিকল্পনায় গিজগিজ করা মাথাওয়ালা মানুষকে গুরুত্বই দিলেন না। যাক গে, আশেপাশে



শ্রী নবগ্রহ শনিমন্দির



মহাকালেশ্বর মন্দির

খবর নিয়ে জানা গেল উনিই সেই অঘোরী যিনি রোজ মহাকালের ভস্মাহুতির ভস্মের ব্যবস্থা করেন। বাবা ব্যোম-ব্যোম-নাথ। যাই হোক, নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে গেলাম আরও কিছুটা। থাকার জন্য ধর্মশালা আমার আগে থেকেই বুক করা ছিল। মন্দির ট্রাস্ট কমিটির দুটো ধর্মশালা। একটা মহাকালেশ্বর ধর্মশালা (মহাকালেশ্বর মন্দিরের পাশেই) আর অন্যটা, পণ্ডিত সূর্য নারায়ণ ব্যাস ধর্মশালা (হরসিদ্ধিপুরি মন্দিরের পাশেই)। এগুলোর একটাতেও একটানা দু'দিনের বেশি থাকা যায় না। এদিকে আমার আবার ধড়ফড়ানি পোষায় না। ঘুরতে গেলে তো নয়ই। তাই ঘুরিয়েফিরিয়ে দু'দিন-দু'দিন করে বুক করে রেখেছিলাম ধর্মশালা দুটোতেই। কিন্তু সমস্যাটা ছিল, ধর্মশালার চেক-ইন টাইম দুপুর বারোটা। ঘড়ির কাঁটায় তখনও আটটা বাজেনি দেখে মালপত্তর একটা দোকানে রেখে এগিয়েই গেলাম সামনে। কিছুটা যেতেই বাঁ-পাশে সুন্দর করে সাজানো রাজসভা। না ঢুকে আর থাকা গেল না। সামনেই ত্রিশ ফুটের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আসীন মূর্তি আর তাঁকে ঘিরে তাঁর নবরত্ন সভা। শুধু তাই নয়, সেই সভারই আর এক পাশে রয়েছে তাঁর সিংহাসনের বত্রিশ জন পরির আলাদা আলাদা মূর্তি। এই বিক্রমাদিত্য কখনওই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নন। ইনি জনশ্রুতি অনুসারে বিক্রমসম্বৎ পঞ্জিকার প্রবর্তক শকারি বিক্রমাদিত্য। আর সেই বত্রিশ সিংহাসনের রূপকথার গল্প অনুসারে মহারাজা ভোজ এই জায়গাতেই মাটি খুঁড়ে পেয়েছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশটি পরি সমন্বিত সিংহাসন। জনশ্রুতি আরও আছে যে এখানেই নাকি বিক্রমাদিত্যের রাজসভাটিও ছিল। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। যাইহোক ওখান থেকে বেরিয়ে আরও কিছুটা হাঁটতেই হরসিদ্ধিপুরি মন্দির আর তারপর আর কিছুটা এগোলেই বাঁ দিকে নেমে গিয়েছে একটা ঢালু রাস্তা। রাস্তা ধরে নেমে যেতেই ক্ষিপ্রা নদী, যদিও আমরা শিপ্রা বলি। উত্তর বাহিনী নদী এর আগে আমি দেখেছি খালি তারাপীঠ সংলগ্ন দ্বারকা। তাই জীবনে দেখা দ্বিতীয় উত্তর বাহিনী নদীটার পাড় যেন আমার সারারাতের যাত্রার ধকলটাকে এক লহমায় শুষে নিল। আহা! নদীগুলোকে ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে আমরা সভ্যতামাত্রিক করে তুললেও ক্ষিপ্রা (কথ্য ভাষায় শিপ্রা) যেন এখনও মানুষের বশ্যতা মেনে নেয়নি। যেন সভ্যতার ধারই ধারে না। সামনের ঘাটটাই ছিল রাম ঘাট। এখানেই রামায়ণের সময়কালে রামচন্দ্র দেবী সীতার সঙ্গে দশরথের অস্থি বিসর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই সেই স্থান যেখানে সমুদ্রমন্থনের পর একফোঁটা অমৃত পড়েছিল। পূর্ণ কুম্ভের স্নানের জল এই নদীতেই। চারপাশটা দেখতে দেখতেই চোখ



রাম ঘাটে ক্ষিপ্রা নদীর সন্ধ্যারতি



হরসিদ্ধিপুরি মন্দিরের দালানে একান্ন ফিট উঁচু প্রদীপের স্তম্ভ।



অঘোরী বাবা ব্যোম-ব্যোম-নাথ

জুড়িয়ে যাচ্ছিল। ইতিহাস, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত— সব কিছু যেন জীবন্ত। মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা। বিভিন্ন পুরাণের নানান প্রামাণ্য মন্দির, স্থাপত্য, মহাকাল বন, চুরাশি শিবলিঙ্গ— এ সব দেখতে দেখতেই কখন যে ঘড়িতে বারোটা বেজে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। ধর্মশালায় ফিরে সবকিছু গুছিয়ে সেদিনের মতো একটু বিশ্রাম নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, মহাকাব্য— সব মিলিয়ে এত রত্নের সমাহার এই উজ্জয়িনী নামক খনিটাতে, যে আর ঘুমোতে পারিনি। একটা অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাজা বিক্রমাদিত্যের বানানো শ্রী নবগ্রহ শনিমন্দিরে। জনবসতি থেকে সামান্য দূরে (৬ কিলোমিটার মতো) নিরিবিলিতে ক্ষিপ্রা নদীর ত্রিবেণী ঘাটে সে এক অপূর্ব মন্দির। বসেই থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পরের দিন ভোর চারটেয় মহাকালেশ্বরের ভস্মাহুতি দেখার টানে তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। কিন্তু ঘরে ঢুকে সামান্য বিশ্রামটুকুও যেন সময়ের অপচয়। তাই চটজলদি একবার ক্ষিপ্রা নদীর পাড়ে ক্ষিপ্রা নদীর সন্ধ্যারতি দেখে নিলাম। আর তারপরেই শুরু হল ভস্মাহুতির তোড়জোড়। ভস্মাহুতির বুকিং এখানে আগে থাকতেই করে রাখতে হয়। অনলাইনে তো করাই যায়, তা ছাড়াও মন্দিরের সামনে থেকে আগের দিন কাউন্টার থেকে কিনেও রাখা যায়। সেই ভস্মাহুতি দেখার লাইন পড়ে মোটামুটি আগের দিন রাত্রি এগারোটা থেকে। আমিও অল্প খাবার খেয়ে, স্নান করে, ধুতি এবং একটি উত্তরীয় পরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম লাইনে। সত্যি বলতে কী, ঘুম তো দূরের কথা, ক্ষুধা-মন্দা-ভয়ের কোনও আভাস পর্যন্ত পাইনি। বিশ্বাস বা মাহাত্ম্য বলতে হয়তো এটাকেই বোঝায়। যাই হোক, দুনিয়ার সব কিছু তো আর হাতে লিখে বা বলে প্রকাশ



মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে কারুকাজ।

করা যায় না। অনুভব করার জন্যও কিছু কিছু ছেড়ে রাখতে হয়। তা সারারাত জেগে ভস্মাহুতি দেখার পর পরিকল্পনা ছিল একটু ঘুমিয়ে নেব। ভেবেছিলাম শরীরটা নিজেই হয়তো এলিয়ে যাবে বিছানায়। কিন্তু চোখের পাতা এক হয়নি। হরসিদ্ধিপুরি মন্দিরের সামনে থেকে টুরিস্টদের শহর ঘুরে দেখানোর একটা বাসে উঠে পড়লাম। পঞ্চাশ টাকায় মোটামুটি প্রাগৈতিহাসিক জনপদের অনেক কিছুই দেখিয়ে দেয়। সেই বাসে চড়েই এক এক করে দেখে নিলাম, প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো রাজা ভর্তৃহরির গুহা, মহর্ষি সন্দীপনী মুনির আশ্রম (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সুদামা মহাভারতের সময়ে চোদ্দ রকমের বিদ্যা লাভ করেছিলেন), শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত গণেশ মন্দির, ভূমিপুত্র মঙ্গল গ্রহের জন্মস্থান, মঙ্গলনাথ মন্দির (কর্কটক্রান্তি রেখাটি এই স্থানের উপর দিয়েই গিয়েছে), শ্রী কালভৈরব মন্দির (যেখানে কালভৈরবের মুখের সামনে সুরার পাত্র ধরলে মুহূর্তের মধ্যে সুরা অদৃশ্য হয়ে যায়), মহাকবি কালিদাসের উপাস্য দেবী গড় কালিকা মন্দির এবং সবশেষে আমার অত্যন্ত আগ্রহের বিক্রম বেতালের গল্পে পড়া সেই বটগাছ, সিদ্ধবট। পুরাণমতে দেবী পার্বতী এই বটগাছটিকে রোপণ করলেও আমার চোখের সামনে তখন সেই গাছেরই একটা ডাল ধরে যেন ঝুলে রয়েছে গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা বেতাল!

যাই হোক এই করেই যখন ধর্মশালায় ফিরলাম তখন মন যেন ভরে গিয়েছে। এই কয়েক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে, এত ইতিহাস, এত পুরাণ, এত সাহিত্য, এত বিজ্ঞান যে সেগুলোকে নিয়ে মনে মনে একটু ভাবতে ইচ্ছে করছিল। সে জন্যই চুপচাপ এগিয়ে গেলাম সতীপীঠ মা হরসিদ্ধিপুরি মন্দিরের দালানে। একান্ন ফিট উঁচু দুটি প্রদীপের স্তম্ভে তখন এক হাজার এগারো প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। সন্ধের অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই টুক টুক করে জ্বলে উঠল একটা একটা করে প্রদীপ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ভিতরে হরসিদ্ধি মায়ের আরতির শব্দটা কানে আসতেই কেমন যেন হারিয়ে গেলাম। তবে চোখে-মুখে, সমগ্র শরীরে তখনও যেন লেগে রয়েছে করছে হাজার হাজার বছর আগেকার জনপদের ধুলোবালি। আমি আরও পাঁচদিন ছিলাম। একবার মাত্র দেখে আমার স্বাদ মেটেনি আসলে। তাই দেখা জায়গাগুলোকেই দেখতে গিয়েছিলাম আবারও। মানব শরীরের সমস্তটা শেষ হয়ে গেলেও নাভিটুকু যেমন পড়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই আমি বাড়ি ফিরে এলেও উজ্জয়িনীতে দেখা প্রতিটি দৃশ্য যেন আজও মনে জ্বলজ্বল করছে শাশ্বত, অবিনশ্বর হয়ে।

ছবি: লেখক ও আইস্টক

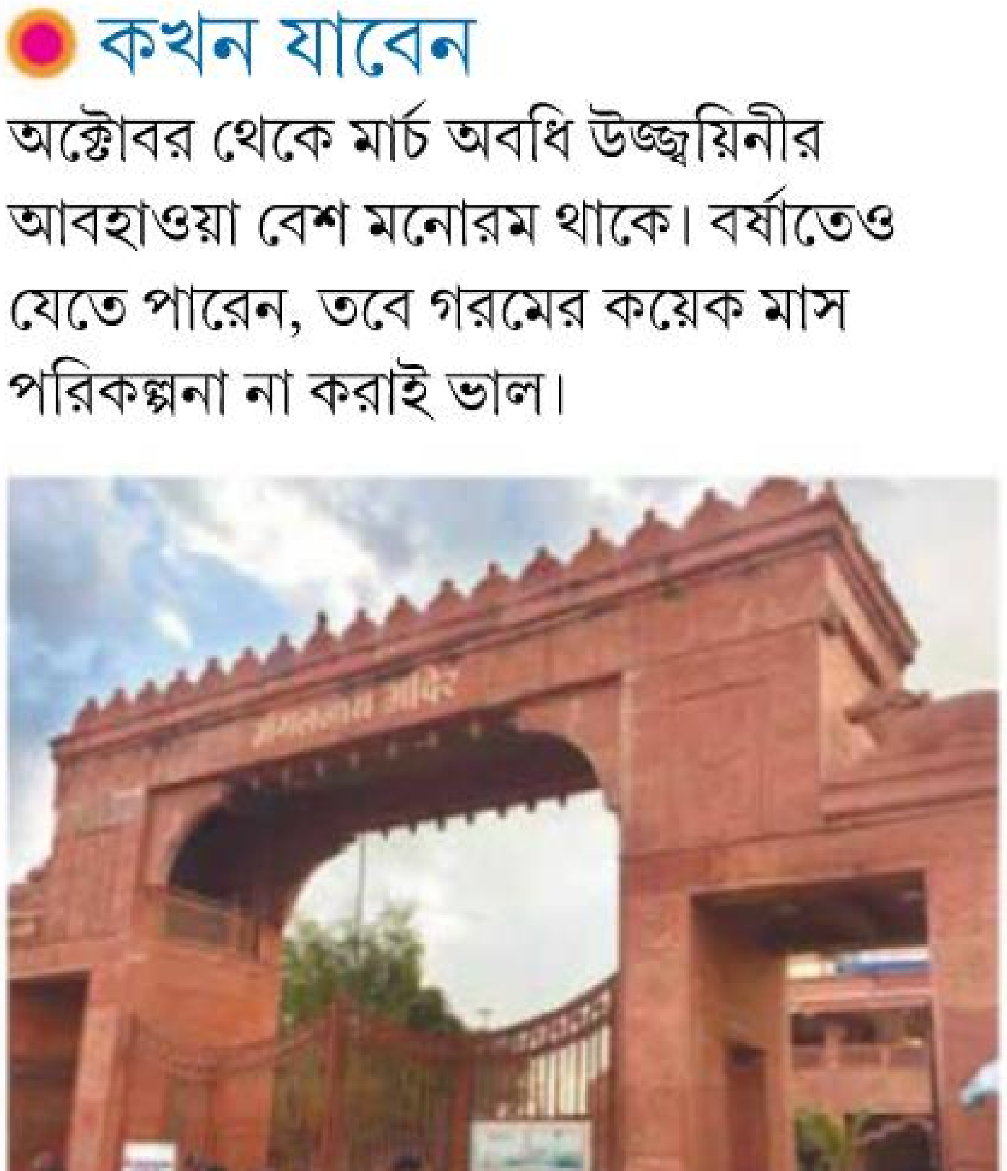
চে ক লি স্ট

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ফ্লাইটে নাগপুর পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে উজ্জয়িনী। অথব ফ্লাইটে ইন্দোর এসে সেখান থেকে বাস নিতে পারেন। এছাড়া হাওড়া থেকে সরাসরি উজ্জয়িনী আসার ট্রেনও পাবেন। তবে সময় বাঁচাতে চাইলে আকাশপথে আসাই সবচেয়ে ভাল।

কখন যাবেন

অক্টোবর থেকে মার্চ অবধি উজ্জয়িনীর আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। বর্ষাতেও যেতে পারেন, তবে গরমের কয়েক মাস পরিকল্পনা না করাই ভাল।



মঙ্গলনাথ মন্দির



নিজেকে 'সানন্দা' পরিবারের একজন মনে করেন তিনি। সানন্দার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ফোটোশুটে সেলিব্রেশন মুডে অভিনেত্রী ইশা সাহা।


সেলিব্রেশনের সাজে



ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তায় বুকস্টলে 'সানন্দা' এবং বিভিন্ন ম্যাগাজ়িন রাখা থাকত। কিন্তু তখন বড়দের ম্যাগাজ়িন পড়ার অনুমতি পেতাম না। বাড়িতে মাকে দেখতাম 'সানন্দা' পড়তে। বড় হওয়ার পর যখন এই ম্যাগাজ়িনটি হাতে নিয়ে দেখলাম, খুব ভাল লেগেছিল। 'সানন্দা'-য় ফ্যাশনের পাতার ছবি দেখে খুব ভাল লাগত। আমি অভিনয় জগতে আসার পর 'সানন্দা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক শুটিং করেছি। এতদিন আমি 'সানন্দা'-র পাতায় ছবি দেখতাম, এখন পাঠকরা আমার ছবি দেখবেন, এই বিষয়টা খুব ভাল লাগে। আজ নিজেকে সানন্দা পরিবারেরই একজন মনে করি। 'সানন্দা'-র জন্মদিন উপলক্ষে এই শুটে থাকতে পেরে খুব ভাল লাগছে। 'সানন্দা' পত্রিকাকে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

বার্থডে স্পেশ্যাল শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোন: ৯৮৩৬৬৮২৯৩৩
পোশাক: কোমল সুদ, পার্ক স্ট্রিট
ফোন: ৯১৬৩৪৬৯৯৮৬
গয়না: নিভি
ফোন: ৯৮৩০৭৭২৫২৫
লোকেশন: অল্টেয়ার বুটিক হোটেল
ফোন: ০৩৩৭১০১৭১০১
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কোঅর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার



ম্যাজিক, জয়সলমির ফোর্ট হয়ে গেল সোনার কেল্লা

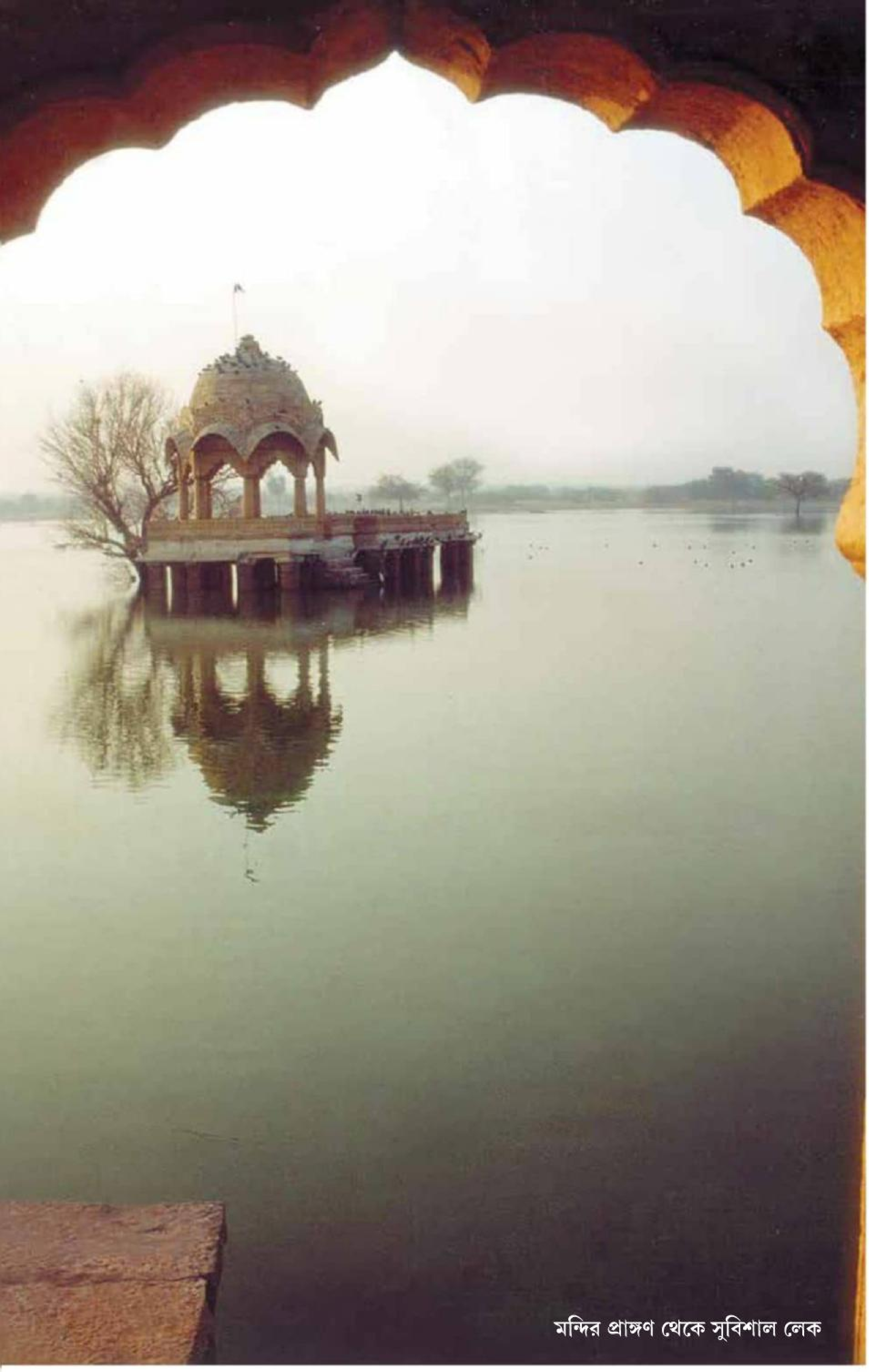
জয়সলমিরের বহু বাড়িতে ঠাকুরের আসনে সত্যজিৎ রায়ের ছবিও পুজো করা হয়। সৌজন্য সোনার কেল্লা। এক বার ঘুরে সম্পূর্ণ রাজস্থান দেখা যায় না। এখানে আসতে হয় বারবার। লিখছেন কমলেন্দু সরকার।



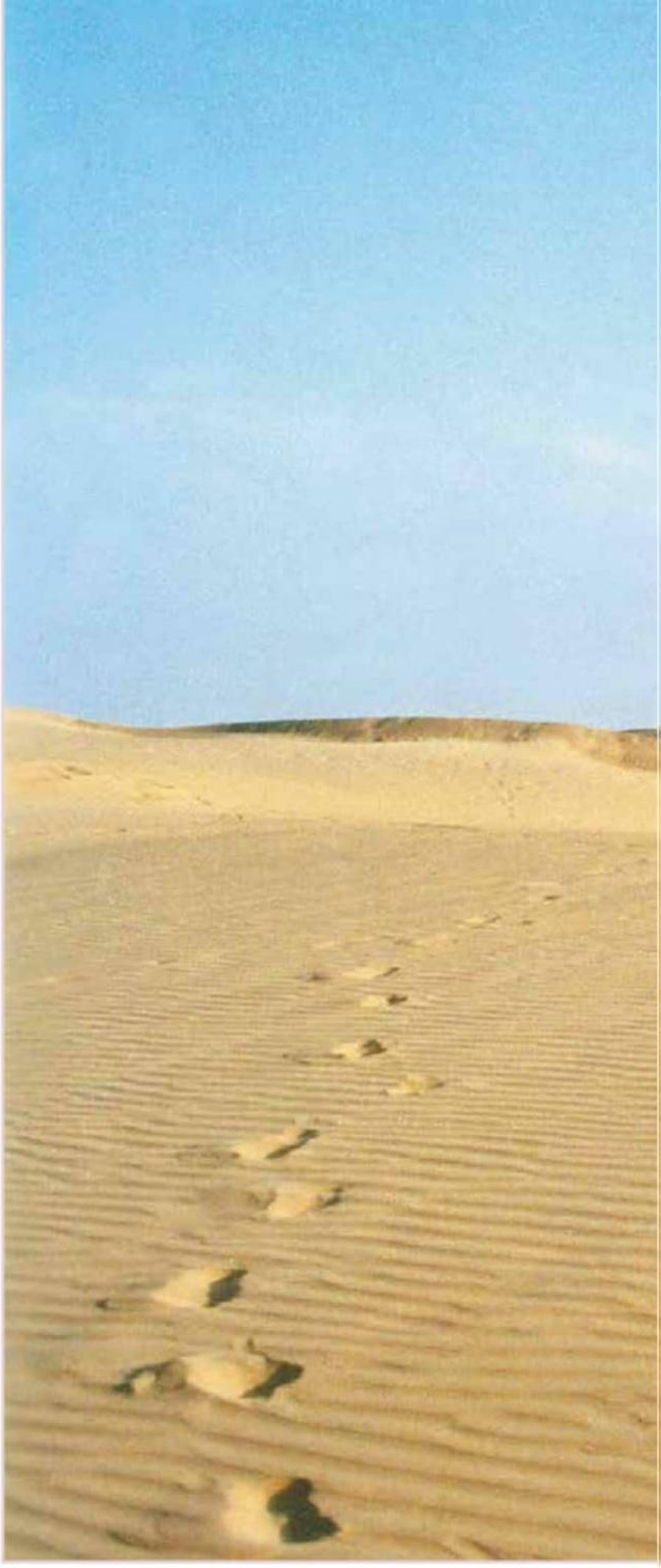
শান্ত শীতল গাদিসর লেক

গাদিসর লেকের কাছে আসতেই গাড়ির জানালা দিয়ে সোনার কেল্লা। দূরে পাহাড়ের মাথায় সোনার মতো উজ্জ্বল কেল্লা। সত্যজিৎ রায় যার নাম দিয়েছেন সোনার কেল্লা। গাদিসর লেক থেকে মাত্র দু'কিমি। চোখে পড়া ইস্তক লালমোহনবাবুর মতো ভয়ানক উত্তেজিত। কখন যাব সোনার কেল্লার ভিতরে, মুকুলের বাড়ি দেখব! রাজস্থান যাওয়ার পরিকল্পনাটা ছিল পরাগের। দু'হাজার সালের পয়লা জানুয়ারির সূর্যোদয় দেখতে হবে মরুভূমির মধ্যে থেকে। তার জন্য তো একটা রাত কাটাতে হবে মরুঅন্দরে। তা তো হবেই। তার জন্য বহু কাঠখড় পুড়িয়ে থাকতে হয়েছিল মরুভূমির বালির বিছানায়।

গাদিসর লেক থেকে মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছলাম সোনার কেল্লার কাছে, হোটেল প্রিন্স-এ। হোটেলের নামটি বাংলায় লেখা। পরে দেখেছি প্রায় সব হোটেলেই বাংলায় লেখা খাবার মেনু। আর বাঙালির প্রিয় খাবার যে আলু-পোস্ত তা বুঝতে দেরি হল না! সব হোটেলেই জ্বলজ্বল করছে 'এখানে আলু-পোস্ত' পাওয়া যায়। হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্তর রেখেই ছুট সোনার কেল্লায়। আমরা যোধপুর ঘুরে জয়সলমির এসেছি। কমবেশি ঘণ্টা ছয় লেগেছিল আসতে। বিকেলের মুখে পৌঁছেছিলাম। যতটা সময় পাওয়া যায় তার মধ্যেই দেখে নেওয়া সোনার কেল্লা। পরদিনই ৩১ ডিসেম্বর, রওনা দেওয়া হল মরুভূমির অন্দরমহলে। হোটেলের বদান্যতায় একটা



মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সুবিশাল লেক



গাড়ি ম্যানেজ করা গেছে। সেই গাড়িতেই খুরি। জয়সলমির থেকে খুরি গ্রাম কমবেশি ৫০-৫১ কিমি।
সাততাড়াতাড়ি ড্রাইভার এসে গেলেন। চমৎকার চেহারা। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। পরিচয় হল। উনি একদা মিলিটারিতে ছিলেন। জয়সলমিরের সমস্ত রাস্তা ওঁর নখদর্পণে। উনি বললেন, "আমরা অন্যরকমভাবে যাব। সবাই যেমনভাবে যায় তেমনভাবে নয়। ডেজ়ার্ট সাফারি করব। লোদুর্ভা যাব। ন্যাশনাল ডেজ়ার্ট পার্কও যাব। চলুন না, মজা পাবেন।" ড্রাইভার ভদ্রলোকের নামটি এখন আর স্মরণে নেই। এর বেশ কয়েক বছর পর জয়সলমির গিয়ে খোঁজ করেছিলাম। খোঁজ, দেখা, কিছুই পাইনি। যাই হোক, রওনা তো হলাম। শুধু মরুভূমির মধ্যে ঘুরেই যাচ্ছি, কোনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না। ড্রাইভার সাহেব বললেন, পথ হারিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে বালির ঝড় হয়ে রাস্তাগুলো সব ঢেকে গেছে। শেষপর্যন্ত পৌঁছলাম লোদুর্ভা। জয়সলমির থেকে ১৫-১৬ কিমি দূরে। পুরনো রাজধানী। পুরনো রাজধানীর খণ্ডহর আজও তার সাক্ষ্যবহন করছে। জৈন মন্দিরটি খুব সুন্দর। শ্বেতপাথরের সিংহাসনে তীর্থঙ্কর। কষ্টিপাথরের মূর্তি। মন্দিরটি পুরো শ্বেতপাথরের। মন্দিরটি অপূর্ব! কাছেই অমর সাগর। বর্ষার জল ধরে জলাভাব মেটাত অমর সাগর। নির্মাণ করেছিলেন অমর সিংহ।
জয়সলমিরের পুরনো রাজধানী লোদুর্ভা ঘুরে রওনা দিলাম অন্যদিকে। ড্রাইভারসাহেব বললেন, "এবার যাব এক ভূতের গ্রামে।" বললাম, তার মানে! এই ভরদুপুরে ভূত আসবে কোথা থেকে! উনি বললেন, "ভূতেদের আবার সময়-জ্ঞান আছে নাকি! যখন-তখন বেরিয়ে পড়ে। আপনাদের ভূতের ভয় নেই তো?" ভূত



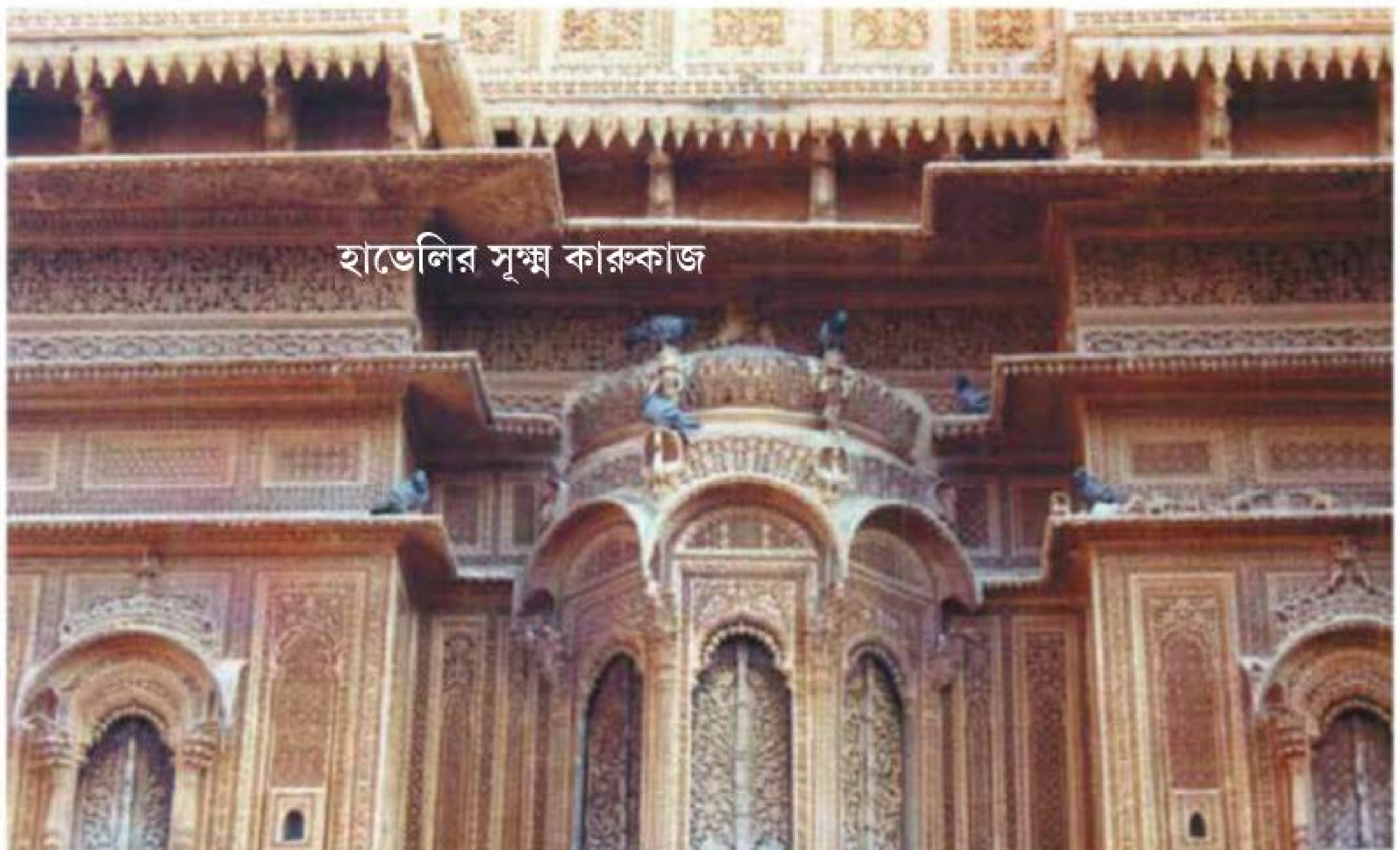
মরুভূমির জাহাজ...

এলে আসবে। ছোটবেলায় শেখা মন্ত্রটি বলে দেব— ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কী। বললাম, চলুন ভূতের গ্রামে। জয়সলমির থেকে ২০-২১ কিমি দূরে ভূতের গ্রামের নাম কুলধাড়া। চারিদিক একবারে শুনশান! একটিও মানুষ চোখে পড়ল না। আমরা কয়েকজন ছাড়া। ধু ধু মরুপ্রান্তরে বিশাল একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। ভূতে যদি ঘাড় মটকায়, রক্ষা করতে আসবেই-বা কে! মানুষই তো নেই চৌহদ্দিতে। মনে হল, কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পৌঁছেছি। তবে এখানকার ইতিহাস ৭৩০ বছর পুরনো। সময়টা তেরো শতকের শেষদিক। সালটি ১২৯১। পালিওয়াল সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে এসে এখানে প্রথম বাস করতে লাগলেন। তারপর বহু পালি ব্রাহ্মণ এলেন কুলধাড়ায়। জমে উঠল বসতি। জয়সলমির থেকে প্রায় ৩৫০ কিমি দূরে পালি শহর। সাত-আটশো বছর আগেও রমরমা ছিল পালির। তখন অবশ্য নাম ছিল পল্লিকা। লোকমুখে পল্লি। প্রথম যে-ব্রাহ্মণ এখানে এসেছিলেন তাঁর নাম কড়হান। পালিওয়াল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা চাষবাস এবং ব্যবসাবাণিজ্যে ছিলেন দক্ষ। পালি থেকে এসেছিলেন তাই তাঁদের বলা হত পালিওয়াল ব্রাহ্মণ। জানা যায়, এই গ্রামে সেকালে নাকি ১৫-২০ হাজার লোকের বাস ছিল।

এমন এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম হঠাৎ ধ্বংস হল কেন? এর পিছনে আছে এক ব্রাহ্মণ সুন্দরী আর রাজপুত পুরুষের কাহিনি। এখানকার গ্রামপ্রধানের কন্যা ছিলেন অতীব সুন্দরী। চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো। একদিন সেই সুন্দরীকে দেখে ফেলেন দেওয়ান সলিম বা সেলিম সিং। তাঁর চমৎকার এক হাভেলি রয়েছে জয়সলমিরে। সেলিম সিং তাঁর রূপে পাগল হয়ে ওঠেন। এমন সুন্দরীকে



গ্রামের অন্দরে



হাভেলির সূক্ষ্ম কারুকাজ

বিয়ে করতে না-পারলে জীবনই বৃথা। তিনি সরাসরি গ্রামপ্রধানকে প্রস্তাব দিলেন তাঁর কন্যাকে বিয়ে করতে চান। হুমকিও দিলেন, বিয়ে না-দিলে সুন্দরীকে হরণ করবেন এবং জমির খাজনাও হবে দ্বিগুণ।

ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ অ-ব্রাহ্মণের সঙ্গে, এ কখনওই সম্ভব নয়।

সেলিম সিংয়ের কাছ থেকে একটি দিন চেয়ে নিলেন গ্রামপ্রধান। বললেন, কাল সকালেই আপনার হাতে তুলে দেব কন্যাকে। আজ আপনি জয়সলমির ফিরে যান। গ্রামপ্রধানের কথায় আস্থা রেখে সেলিম সিং ফিরলেন তাঁর হাভেলিতে। সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। গ্রামপ্রধান সকলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল আজ রাতেই গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে যাবেন দূরে কোথাও। যেমন ভাবা, তাই কাজ। রাখিপূর্ণিমার রাতে সকলে কুলধাড়া ছেড়ে চললেন নিরুদ্দেশের পথে। ওঁদের পথে আলো দিয়েছিল চাঁদের অফুরান জ্যোৎস্না। জানা যায়, সবাই একপথে যাননি। দল ভাগ করে নিয়েছিলেন। শোনা যায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পালি ব্রাহ্মণেরা। ওঁদের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

আজ কুলধাড়ায় শুধুই শূন্যতা। জনমানবহীন গ্রামে পাক খেয়ে খেয়ে ফেরে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস! ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলে যায়! রাতে তো বটেই, দিনের বেলাতেও সরে যায় ছায়ামূর্তি! খিলখিল করে হেসে ওঠে

শিশুরা। দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যায় হাতের ছাপ। কিন্তু কোথায় কে? কেউ নেই আশপাশে। অনেকেই বলেন, কুলধাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া গ্রামবাসীর অতৃপ্ত আত্মারা নাকি ফিরে আসে, দেখতে আসে পুরনো জায়গাটিকে। সেলিম সিংয়ের আত্মাও নাকি মেয়েটিকে আজও খুঁজে বেড়ায় মরুপ্রান্তরে। অতিপ্রাকৃত ঘটনা নাকি আজও ঘটে কুলধাড়ায়! অতি উৎসাহীরা কুলধাড়ায় এলেও, অনেকেই পা-দিতে সাহস করেন না। কুলধাড়ার পরিচিতি আজ রাজস্থানের ভূতগ্রাম। আশপাশের স্থানীয়রা কেউ এখানে আসেন না। তাঁরা বলেন, এলেই নাকি গা-ছমছম করে! শরীরে শিহরন বয়ে যায়! আসলে নাকি জলকষ্ট, জলাভাবের কারণে গ্রামের মানুষজন অন্যত্র চলে যান।

ভূত আমরা দেখিনি বটে, কিন্তু কুলধাড়া থেকে বেরিয়ে আমরা মরুভূমির মাঝে চক্কর কেটেছিলাম বেশ কয়েক ঘণ্টা! ড্রাইভার সাহেবের মতো মানুষ ভয় পেয়ে গেছিলেন। হয়তো ভূতের করুণাবশত পথ খুঁজে পেয়েছিলেন ড্রাইভার সাহেব। শেষমেশ খুরির পথে রওনা দিলাম। মরুর যে এত রূপ-সৌন্দর্য আছে তা খুরি না-গেলে হয়তো বুঝতে পারতাম না। খুরি যখন পৌঁছলাম তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। আমাদের আস্তানা হল আমির সিংহের বাড়ি। তবে আমরা তো ঘরে থাকব না। থাকব কিছুটা দূরে মরুভূমির মধ্যে। আমাদের জন্য দুটো তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছেন আমির সিংহ। রাতের খাওয়া সেরে সেঁদিয়ে গেলাম তাঁবুর ভিতর। কিছুক্ষণ পর মজাটা টের পেলাম। রাত যত বাড়ে ঠান্ডা তত বাড়ে। মরুভূমির ঠান্ডা সহ্য করা বেজায় কঠিন। বালির ওপর বেশ কয়েকটি কম্বল বিছানো। গায়ে দেওয়ার জন্য দুটো রেজাই। কিছুতেই ঠান্ডা কাটে না। মোজা-জুতো পরেই শুয়ে পড়লাম। বাঁধভাঙা জলের মতো হু হু করে ঠান্ডা লাগছে শরীরে! অত ঠান্ডায় টানা ঘুম হয় না। মাঝমধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে। হঠাৎই মাঝরাতে তাঁবুর চারপাশে কেউ ঘুরছে মনে হল। পাশের তাঁবু থেকে ড্রাইভার সাহেবের সাবধানবাণী ভেসে এল, "ভুলেও বাইরে বেরোবেন না। কোনও একটা জন্তু এসেছে মনে হচ্ছে।" এ তো গোদের ওপর বিষফোঁড়া! একা ঠান্ডায় রক্ষে নেই, মরুজন্তু দোসর। ভয়ে হোক বা ভীতিতে, ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে ড্রাইভার সাহেবের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। কয়েক মিনিট পরই সূর্য উঠল মরুভূমির হৃদয় হতে। সে-এক অপূর্ব দৃশ্য! জন্মজন্মান্তরেও ভোলার নয়, ভুলিনি একুশ বছর পরেও! যে-উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া, তা সফল। এবার তাঁবু ছেড়ে আমির সিংহের ঘরে। ঘরগুলো অসাধারণ! ভীষণই রঙিন। গতকাল রাতে অতটা বোঝা যায়নি। আমির সিংহের যেমন অমায়িক ব্যবহার তেমনই সুপুরুষ চেহারা। আমাদের প্রাতরাশ তৈরিই ছিল। হাতমুখ ধুয়ে তা উদরস্থ করা হল। আমির সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বেশ কয়েকবছর পর জয়সলমির সোনার কেল্লার সামনে দেখে চিনতে পেরেছিলেন আমির সিংহ। নির্মল, সুজাতা, ওদের পুত্র শর্মদীপ আর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন খুরিতে ওর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। দু'বারের খুরি যাওয়ার অভিজ্ঞতা দারুণ! প্রথমবারেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল মরুজাহাজে মরুভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর নিয়ে গেছিলেন উটের মালিক। স্যান্ড ডিউন বা বালিয়াড়ির বুকে কতরকমের নকশা হতে পারে তা চাক্ষুষ না-করলে বিশ্বাস হবে না! স্যাম বালিয়াড়িও ভারী সুন্দর, কিন্তু ভীষণ ভিড়। তুলনায় খুরি অনেক শান্ত। লোকজনের ভিড় না-থাকায় মনের আনন্দে ঘোরা যায়। হঠাৎ উটের মালিক বললেন, "চলুন, ফেরা যাক। নইলে বিপদে পড়তে হবে।" বিপদের কারণটি কিছু বললেন না। তবে



রাতের আলোয় সোনার কেল্লা

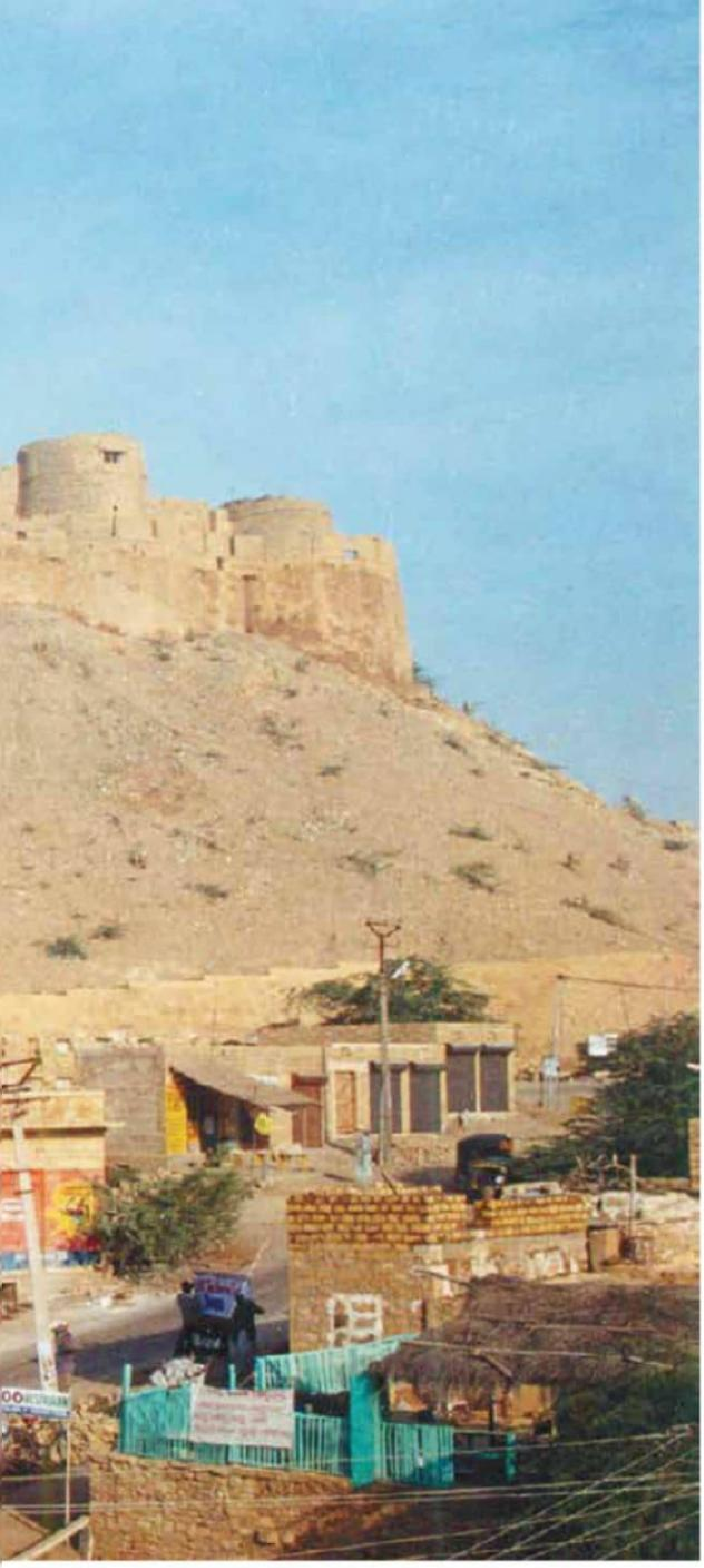


দিনের আলোয় জয়সলমির ফোর্ট

বিপদ টের পেলাম আমির সিংহের ডেরায় পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পর। চারিদিক কাঁপিয়ে বালির ঝড় উঠল। আমির সিংহ বললেন, “ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিন, খুলবেন না।” অতিকৌতূহলে দরজা সামান্য ফাঁক করতেই মালুম পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে সারা গায়ে বালি। নাক, চোখ ঢাকা ছিল বলে বেঁচে গেলাম। মরুঝড়ে পড়া এক বিশাল অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়বারে মরুঝড় আর ওঠেনি। তাই ঘণ্টা দুই ডেজ়ার্ট সাফারি করালেন উটের মালিক। উট কত জোরে ছুটতে পারে তা বুঝলাম। প্রায় লালমোহনবাবুর মতো অবস্থা হওয়ার উপক্রম। কিছুক্ষণ পর উট থামল।

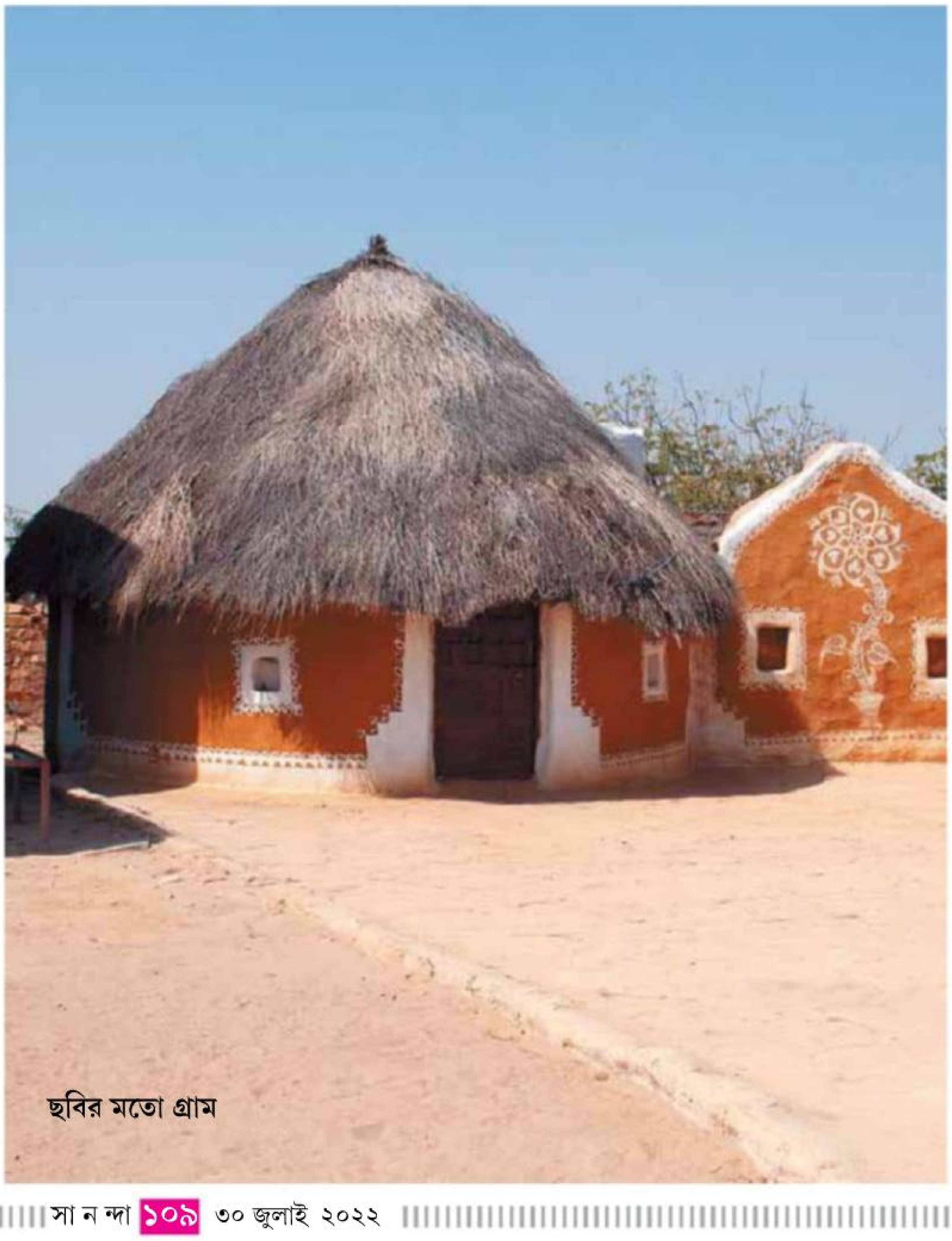
খুরি গ্রামটি সুন্দর। ছোট ছোট মাটির বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে নানা রঙের ছবি আঁকা। পিকচার পোস্টকার্ড মনে হয়। ঘরে ঘরে নানারকম হ্যান্ডিক্রাফটস তৈরি করেন বাড়ির মহিলারা। হ্যাঁ, কেনাও যায়। খুরি থেকে বেরিয়ে গন্তব্য ন্যাশনাল ডেজ়ার্ট পার্ক। ধু ধু মরুভূমির মাঝে সবুজ। এখানে রয়েছে নানারকম মরুজন্তু। গতকাল সন্ধ্যায় আসবার পথে দেখেছিলাম একটা মরু শৃগাল। সে রাস্তার একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে গেল বিশাল এক লাফে। আছে প্রচুর কৃষ্ণসার, চিঙ্কারা ইত্যাদি। দলে দলে উট চলে। কেউ কাঁটা বেছে খায় না। মাঝেমধ্যে ময়ূর তার পেখম তুলে নাচে। প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড। বিশাল আকারের পাখিগুলো দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটি আমাদের ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও পাত্তা দিল না। বোঝা গেল, ওরা মানুষ দেখে দেখে অভ্যস্ত। ড্রাইভার সাহেব আমাদের ঘুরিয়ে এনেছিলেন উড ফসিল পার্ক থেকেও। এখানে আছে ১৮ কোটি বছরের পুরনো ফসিল। জানা যায় মরুসংক্রান্ত নানা খবরাখবর, তথ্য। এই অঞ্চলটি এককালে ছিল জলের নীচে।

খুরি পর্ব শেষ করে আবার জয়সলমিরে প্রত্যাবর্তন। তবে সরাসরি নয়, মাঝপথে স্যাম স্যান্ড ডিউন-এ নামি। এখানকার রূপ-সৌন্দর্য পূর্বশ্রুত। যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনই! তবে এখানে আর উটের পিঠে নয়, মরু-বালিয়াড়িতে পা-ডুবিয়ে হেঁটে ঘুরলাম। বেশ লাগল! খুরি থেকে ফেরার পথে আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আসেনি। পিচরাস্তা ধরেই এলাম। সোনার



হয়।”
বারো শতকে এই কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন রাজা রাওয়াল জয়সল। রাজার নামেই কেল্লার নামকরণ হল। এর পিছনে আছে এক পৌরাণিক কাহিনি। অর্জুনকে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাদবকুলের কেউ একজন ত্রিকূট পাহাড়ে গড়ে তুলবেন নতুন রাজ্য। রাজা রাওয়াল জয়সল ছিলেন যাদব বংশীয়। ১১৫৬-তে এই কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ৮১৮ বছর পর সত্যজিৎ রায়ের এক ছবিতেই ম্যাজিক! বদলে গেল কেল্লার নাম! জয়সলমির কেল্লা হল সোনার কেল্লা। বাঙালি তো বটেই, সারা বিশ্বে জয়সলমির কেল্লা এখন সোনার কেল্লা। স্থানীয় একজন বলেছিলেন, “এটা হোক ‘সত্যজিৎ রে সিটি’।”
বহু মানুষ একটি ছোট ভাঙা বাড়ি দেখিয়ে বলেন, “এটাই ছিল মুকুলের বাড়ি।” বহু ভ্রমণপ্রিয় মানুষের কাছে রাজস্থান মানেই সোনার কেল্লা। কেল্লায় প্রবেশ করেই মনে হল সত্যিই রাজস্থানের সিগনেচার সোনার কেল্লা। এককথায় অপূর্ব! ধরে ধরে দেখতে হয় এই কেল্লা। যখন রোদ্দুর পড়ে কেল্লার ওপর তখন মনে হয় গলানো সোনা কেউ ঢেলে দিয়েছে। বিস্ময় জাগে সোনালি কেল্লার গায়ে পাথর-কাটা জাফরির কাজে! কুর্নিশ জানাই সেকালের শিল্পীদের। ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটি জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে যাই। মুকুলের বাড়ির পাশে সেই মন্দির। সেই পাতকুয়া যেখানে ধরা পড়লেন ডক্টর হাজরা অর্থাৎ ভবানন্দ।
জয়সলমির বা সোনার কেল্লা তৈরি হয় চিতোরগড়ের পরই। তাই অন্যতম পুরনো কেল্লা রাজস্থানের। সেকালে দিল্লি থেকে বণিকেরা জয়সলমির হয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করতে যেতেন আরব দুনিয়ায়। সেইসময় খুবই রমরমা ছিল জয়সলমিরের। সেসব ছিল গৌরবময় দিন। বর্তমানে জয়সলমিরের গৌরব তার সোনার কেল্লাকে ঘিরে। কেল্লায় রয়েছে চারটি প্রবেশদ্বার। সূরয, গণেশ, অক্ষয় আর হাওয়া পোল। পাঁচমহলা সাততলা রাজপ্রাসাদে চোখ পড়লে আর ফেরানো যায় না দৃষ্টি! আছে জেনানা মহল, রঙমহল, মোতি মহল, জুনা মহল আর গজবিলাস। প্রতিটি মহলেই মুর্যাল, গ্লাস পেন্টিং ইত্যাদি দেখলে বিস্ময় জাগে! দুর্গের ভিতর রাজপুত রমণীরা জহরব্রত

কেল্লা দেখতে হবে। সত্যজিৎ রায়ের ম্যাজিকে যে-দুর্গ বিশ্ববাসীর কাছে হয়ে উঠেছে সোনার কেল্লা। সত্যজিৎ রায় যে স্থানীয় মানুষের কাছে দেবতার আসনে, তা দেখেছি অটোতে উঠে। অটোতে উঠে গাদিসর লেক যাব। ড্রাইভারের পাশে বসে নজরে এল অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ও পুজো পাচ্ছেন। অটোর ড্রাইভারটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এঁকে চেনেন? ড্রাইভার ছেলেটি বললেন, “সত্যজিৎ রায়। এঁর জন্যেই তো আমরা দুটো পয়সার মুখ দেখছি। আগে এখানে এত টুরিস্ট আসতেন না। ‘সোনার কেল্লা’র পর থেকেই হু হু করে টুরিস্টরা আসছেন। আমাদের এখানে বহু বাড়িতে ঠাকুরের আসনে সত্যজিৎ রায়ের ছবিও পুজো করা



ছবির মতো গ্রাম


নিখুঁত স্থাপত্য

করতেন সতীয়োঁ কি সিঁড়িয়ায়। এছাড়াও আছে একাধিক মন্দির। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের কাছেই সেই পাতকুয়া। মানুষের বিশ্বাস, এটি নাকি সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে। অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটি জৈন মন্দিরও। সোনার কেল্লায় শ্বেতপাথর আর বেলে পাথরের অপূর্ব নকশা আর কারুকাজ মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে!
কেল্লা ছেড়ে হাভেলির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। বেনারসের মতো সরু সরু গলি। সেই গলির অন্দরে সব হাভেলি। কত বিস্ময় লুকিয়ে! বিত্তশালীদের অর্থ, শিল্পীর কল্পনা আর শিল্পশৈলীর মিশ্রণে নির্মিত এইসব হাভেলি। অনিন্দ্য সুন্দর পাটোয়াঁ কা হাভেলি। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় রূপকথার জগৎ! কল্প জগতে নিয়ে যায় আরও দুই হাভেলি, সেলিম সিংহ আর নাথমলজি। তিনটি হাভেলির বিশালতা বিস্মিত করে! হাভেলির অন্দরে দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখলে মন ভরে যায়। আর হাভেলির ঝারোখা, পাথরের খিলানের কাজ এত চিকন, এত নিখুঁত যে, দেখতে দেখতে মাথা ঝুঁকে সেলাম জানাতেই হয় নাম না-জানা শিল্পীদের। ছবিগুলোর বিষয়ে তখনকার রাজপুত রমণীদের জীবনযাত্রা, ফুল, লতাপাতার প্রাধান্যই বেশি। রুক্ষ মরুভূমিকে রঙিন করে তুলতে রঙের ব্যবহার লা-জবাব। অবাক লাগে যে, ছবিগুলোর রং এখনও অমলিন! সারাটা দিন লাগে তিনটি হাভেলি দেখতে। সোনার কেল্লার কাছেই বিয়াস ছত্রি। হাঁটাপথ। নিরিবিলি জায়গা। সূর্যাস্ত দেখবার জন্য জয়সলমিরের সেরা জায়গা।
জয়সলমিরের বাজারটিও ভারী সুন্দর। সবসময় ঝলমলে। রাত ন'টা-সাড়ে ন'টাতেও জমজমাট। কত রং! মনে হয়, রঙের হাট! পাওয়া যায় রাজস্থানের সমস্তরকম হস্তশিল্প। পাওয়া যায় রুপো আর কুন্দনের জুয়েলারি। তবে সবচেয়ে মন কাড়ে জাঁতি। জাঁতির যে এত রকমফের আছে জয়সলমির বাজার না-ঘুরলে জানতে পারতাম না। কোনওটা নারী-পুরুষের যুগল মূর্তি, আবার কোনওটা পেখম তোলা ময়ূর, কোনওটা-বা রাজা-মহারাজার মুখ। দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করবে। তবে দরাদরি করবেন, নইলে কিন্তু ঠকতে হবে।
তাড়াহুড়ো করে জয়সলমির চলে আসায় যোধপুর ঠিক করে দেখা হয়নি। দেখার কথাও ছিল না। যেহেতু যোধপুর থেকেই ফেরার কথা তাই ফিরতি পথে দেখার কথা। দিনের আলো থাকতেই পৌঁছলাম যোধপুর। সেদিনটি ছিল গা-এলানোর জন্য বরাদ্দ। হোটেলের বাইরে আর নয়। পরদিন সকাল থেকেই কেল্লামুখী। মেহরানগড় ফোর্ট। বিশাল কেল্লা। কেল্লার প্রবেশপথেই রাজস্থানি কায়দায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন বাদ্যযন্ত্রীরা। পাঁচ কিমি দীর্ঘ ম্যাজেস্টিক ফোর্ট মেহরানগড় কেল্লা। এই কেল্লার বয়স সাড়ে পাঁচশোর বেশি। ১৪৫৯-এ মেহেরনগড় দুর্গ তৈরি করেছিলেন রাঠোর রাজা রাও মালদেও যোধা। তাঁর নামেই শহরের নামকরণ যোধপুর। মূল কেল্লার প্রবেশদ্বার দু'টি। একটি জয়পোল, অন্যটি ফতেপোল। পুব দিকে জয়পোল তৈরি করেছিলেন মহারাজা দ্বিতীয় মান সিংহ। জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহকে পরাজিত করার স্মরণে নির্মিত। পশ্চিমে ফতেপোল অর্থাৎ বিজয় তোরণ। এটি মহারাজা অজিত সিংহ করেন মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে। এখনও দেখা যায় কেল্লার গায়ে মুঘল সেনাদের কামান দাগার দাগ। এছাড়াও আছে আরও পাঁচটি পোল অর্থাৎ প্রবেশদ্বার। সাত নম্বর পোল বা লোহাপোলের দ্বারে রয়েছে ১৫ জন সতীর হাতের ছাপ। যাঁরা রাজা মান সিংহের সঙ্গে সহমরণে গেছিলেন। এই পোলের কাছেই রাঠোরদের গৃহদেবতার

মন্দির। মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকাজ মুগ্ধ করে।
মূল দুর্গের ভিতর রয়েছে একাধিক মহল, কক্ষ এবং গোপন পথ। মেহেরনগড় দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। কেল্লার স্থাপত্য-শিল্পশৈলী অতুলনীয়! শোনা যায়, মেহেরনগড় ফোর্টের প্রধান স্থপতিকে নাকি হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, দুর্গের গোপন খবর যাতে শত্রুর কাছে না-যায়। কেল্লার এক একটি মহল ভিন্ন ভিন্ন রাজার তৈরি। ফুলমহলটি অসাধারণ। বিস্মিত করে দরবার হলের নকশা আর কারুকাজ! জানা যায়, এই মহলটির অলংকরণে সোনা লেগেছিল ৮০ কেজি! পালকি ঘরে কতরকমের পালকি! মোতিমহলের দেওয়াল আর ছাদ জোড়া কাজ অবাক করে! দৌলতখানায় আছে রাজাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। সম্ভবত এখানেই দেখেছি মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের পোশাক। পোশাকের সাইজ দেখলেই বোঝা যায় সম্রাটের চেহারা কেমন ছিল! অস্ত্রাগারে আছে সেকালের ব্যবহৃত কতরকমের অস্ত্র। এমনকী মুঘল সম্রাট আকবর ব্যবহৃত তরবারিও শোভা পাচ্ছে। মেহরনগড়ের মহলে মহলে মিনাকারির কাজ, মিনিয়েচার পেন্টিংস আর রঙিন কাচের কাজ দেখলে মন জুড়িয়ে যায়!
কাছেই উমেদ ভবন। তবে এটি পুরনো নয়। বিশ শতকের বিশের দশকে তৈরি। মহারাজা উমেদ সিংহ প্রজাদের জীবনরক্ষার্থে নির্মাণ করেছিলেন এই প্রাসাদ। এই প্রাসাদের অন্দরমহলে রয়েছে অসাধারণ সংগ্রহ! আট কিমি দূরে মান্ডোর। এখনও আছে পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ। তখন নাম ছিল মান্ডব্যপুর। এখানে আছে দেড় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো কৃষ্ণমন্দির। পাঁচ-ছ'কিমি দূরে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে বালসমন্দ সরোবর। তবে এর থেকেও চমৎকার পরিবেশ কৈলানা লেকের। বিশাল বড়। চারিপাশ গাছগাছালিতে ঘেরা। তারই ছায়ায় হ্রদের জলও সবুজ। লেকের জলে পা-ডুবিয়ে বসে আড্ডা দিতে বেশ লাগে। যোধপুরের বাজার বেশ জমজমাট। বহুরকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তুলনামূলক দামও কম এখানে।
সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে ওশিয়াঁ। যোধপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে থর মরুর বুকে বহু প্রাচীন শহর। এখন দেখলে বুঝতেই পারবেন না তেরো-চোদ্দোশো বছর আগে কত সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল ওশিয়াঁ। কালের আড়ালে চলে গেছে বহুকিছু। আজও যেটুকু বেঁচে আছে তা দেখলে অবাক লাগে।
অসাধারণ সব মন্দিরস্থাপত্য, মন্দিরভাস্কর্য! পুরনো স্থাপত্য, পুরনো শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে গড়ে উঠেছে আধুনিক শহর ওশিয়াঁ। এখানেও বাড়তি আকর্ষণ উট-সাফারি। এক-ভ্রমণে রাজস্থান দেখা, ঘোরা সম্ভব নয়। তাই বারবার রাজস্থান।

ছবি: লেখক

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে যোধপুর এক্সপ্রেসে। আর রাজস্থান ঘোরার জন্য বাসই ভাল। অত্যন্ত ভাল বাস সার্ভিস। যাঁরা গাড়িতে ঘুরতে চান, ঘুরতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

প্রতিটি জায়গায় ভাল মানের দামি এবং বাজেট হোটেল পাবেন। রাজস্থান টুরিজমের জন্য কলকাতার দফতরে যোগাযোগ করতে পারেন। কমার্স হাউস, একতলা, রুম- G2, ২ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, (বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ওরিয়েন্ট সিনেমা হলের বিপরীতে), কলকাতা-৭০০ ০১৩।


জনমানবশূন্য কুলধাড়া



শ্বেতা ত্রিপাঠি শর্মা ওটিটি-র জনপ্রিয় মুখ। পরদায় যেরকম চরিত্রের মতো হয়ে ওঠেন শ্বেতা, পরদার বাইরে একেবারে প্রাণবন্ত। তাঁর সঙ্গে জুম আড্ডায় মধুরিমা সিংহ রায়।

“নেগেটিভিটি প্রচুর আছে। একটু ভালবাসা ভাগ করে নেওয়া যাক”

আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের নাম ‘বটাটাবড়া’। এরকম নামকরণ কেন?

বটাটা মানে আলু। আপনি যে কোনও রান্নাতেই আলু দিন না কেন, সেই রান্নার স্বাদের সঙ্গে নিজেকে একদম মানিয়ে নেবে। চটপটা খাবারেও থাকতে পারে, আবার চাইনিজেও। পৃথিবীর যে কোনও কুইজ়িনেই আলু অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু রান্নার ফ্লেভারের সঙ্গে মানানসই। আমিও সেরকমই খানিকটা। আমি চাই আমার চরিত্রগুলো আলাদা ফ্লেভারের হোক, দর্শক যখন দেখবেন, আলাদা আলাদা অনুভূতি জাগবে তাঁদের।

কিছুদিন আগেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ‘এসকেপ লাইভ’ মুক্তি পেল। আপনি এমনিতেও বেশ বেছে বেছে কাজ করেন। এই প্রজেক্টে হ্যাঁ বললেন কেন?

কনসেপ্ট আর গল্পের জন্য। ‘মির্জ়াপুর’-এ যেমন অনেক চরিত্রই বাস্তবের থেকে অনুপ্রাণিত, এই সিরিজ়ে তেমনটা নয়। সব চরিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু গল্পটা এখন বাস্তবে যা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে, তার উপর ভিত্তি করেই। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা এতটাই বেশি যে আপনি কাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, তার চেয়ে বেশি জরুরি ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার বা লাইকের সংখ্যা! আমি তো অনলাইনে বার্থডে উইশ করাও বন্ধ করে দিয়েছি। কে না কে বাদ পড়ে যাবে, মনে রাখাই মুশকিল। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেদের একটু আলাদা রাখা জরুরি। কারণ, আমরা নিজেদের সঙ্গে কানেক্ট করতেই ভুলে যাচ্ছি এর ফলে! আমরা কে, এই প্রশ্নটা ভিতর থেকে আসতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন জিজ্ঞেস করি, আজকাল তো কোন অভিনেতার কত ফলোয়ার তার ভিত্তিতে

নাকি কাজ পাওয়া যায়। আপনার মনে হয় সেটা?
হতে পারে, পরিবর্তন তো হচ্ছেই। বাট উই শুড ফলো হোয়াট আওয়ার ক্রিয়েটিভ গাট সেজ়। প্রতিভা, অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা হয় এখনও। আমাদের ওই বিষয়গুলোর উপরেই ফোকাস করা উচিত। কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে, কোনও অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারের সংখ্যা বেশি থাকলে হয়তো পাবলিসিটির কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু আবার অন্যদিক থেকে, ফলোয়ার তো কেনাও যায়। কার কতজন ফলোয়ার জেনুইন, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। আমি কখনও ফলোয়ার কিনব না, কখনও কিনিওনি। দ্যাটস মাই থিং। কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে যে অভিনেতা ওই চরিত্রের জন্য অভিনয়ের দিক থেকে উপযুক্ত, তাকেই নেওয়া উচিত। একজন অভিনেতার কাজ হল কাগজে-কলমে থাকা একটি চরিত্রকে পরদায় রক্তমাংসে ফুটিয়ে তোলা। কেউ যদি ভাবেন, ফলোয়ার বাড়ালেই অভিনেতা হয়ে যাবেন, সেটা সঠিক প্রসেস নয়।

আপনি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাডিক্টেড?
আমার কখনও মনে হয় না, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিতে হবে বলে দিচ্ছি। সোশ্যাল মিডিয়া শুড নট বি আ স্ট্রেস। তাই, এখানে আমি কতটা অ্যাক্টিভ, সেই চাপ নিই না কখনও। এই জায়গাটা অন্য মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য। যেমন আমি ডিজ়াইনিং স্টুডেন্ট। অনেক ডিজ়াইনার এখানে আমার বন্ধু। কে কী পোশাক পরছে, কে কী করছে...এসবের জন্য ফলো করি না কাউকে। আমি যাঁদের ফলো করি, তাঁদের কাজের জন্য ফলো করি।

অভিনেতা হিসেবে কোন জঁরে নিজেকে সবচেয়ে বেশি এক্সপ্লোর করতে চান?
আই লাভ ড্রামা। স্ট্রং চরিত্র, যারা একটু কঠিন, ট্রিকি পরিস্থিতিতে পড়ে...তেমন চরিত্র ভাল লাগে। 'ইয়ে কালি কালি আঁখে', 'মির্জ়াপুর', 'গন গেম'—এগুলো আমার খুব প্রিয়। হিউম্যান মাইন্ড এক্সাইট্স মি আ লট। কঠিন পরিস্থিতিতে এই চরিত্রগুলো কী করবে, তা পরিবেশন করতে মুখিয়ে থাকি।

আপনি বরাবরই এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির অধিকার নিয়ে সরব হয়েছেন। ওটিটি-তে এখন এলজিবিটিকিউ চরিত্রদের নিয়ে অনেক গল্প লেখা হচ্ছে। আপনি কতটা খুশি এই চরিত্রায়নে?
দেয়ার ইজ় আ চেঞ্জ। আমরা যদি সকলে সেই পরিবর্তনকে সমর্থন করি, তাহলে তা সোশ্যাল ফেব্রিকের অংশ হয়ে উঠবে। এতদিন ধরে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব হয়নি এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির। কিন্তু প্রথম থেকেই এই বিষয়টি শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। মানুষ হিসেবে একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে চললেই প্রগতি সম্ভব। হতেই পারে, সকলের জার্নি ব্যক্তিগত। কিন্তু সমাজের অংশ হিসেবে প্রত্যেকের পারস্পরিক সমর্থন, বন্ডিং, ভালবাসা জরুরি। অন্যদের আবেগ, জার্নিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এমপ্যাথির প্রসঙ্গ পরে আসবে, আগে আমাদের বুঝতে হবে একে অপরকে। ভাবুন তো, এই গরমে যদি আপনাকে বলি সোয়েটার পরতে, কতটা কষ্ট হবে আপনার। ঠিক সেভাবেই, একজন মানুষ যদি অন্য কারও শরীরে (শরীরে পুরুষ বা মহিলা, মনের দিক থেকে উলটো) বেঁচে থাকেন, তাঁদের পক্ষে এই জার্নিটা কতটা কঠিন! ওঁদেরকে কুর্নিশ এই লড়াইয়ের জন্য। যাঁরা সরব হতে পারেন না, তাঁদের কাছে দমবন্ধকর পরিস্থিতি। নেগেটিভিটি প্রচুর আছে পৃথিবীতে। একটু ভালবাসা, আনন্দও ভাগ করে নিই না! খুব একটা কঠিন নয়।



'মির্জ়াপুর ৩'-এর জন্য নিজেকে অনেকটা বদলে ফেলেছেন। একটু বলুন আপনার ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপারে...
লংগার ফরম্যাটে কাজ করার মজা হল চরিত্রের সঙ্গে আপনি ইভলভ করতে পারেন। গোলু তিনটে সিজ়নে আলাদা। আমি হেয়ারকাট করেছি এই নতুন সিজ়নের জন্য। মেন্টাল আর ফিজ়িক্যাল ফিটনেস দুটোই গুরুত্বপূর্ণ এই চরিত্রের জন্য। আমার মনে হয়, জীবনে এমন অনেক ঘটনা বা মুহূর্ত আসে, যা প্রভাব ফেলে। কিন্তু সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আরও উন্নত করা জরুরি। মানুষ হিসেবে ইভলভ করা জরুরি। গোলু জানে শি হ্যাজ় পাওয়ার। গোলু আরও পরিণত হয়েছে। আগামী বছরে মুক্তি পাবে 'মির্জ়াপুর ৩'। 'ইয়ে কালি কালি আঁখে' পরের বছর শুরু করব। আমার কোনও তাড়া নেই, ধীরেসুস্থে কাজ করি। তাড়াহুড়ো করলে ফাস্ট ফুড তৈরি হবে। আর তা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয় (হাসি)।

ওটিটি একজন অভিনেতাকে অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ লিবার্টি দেয় বলে মনে করেন?
ওটিটি-তে সময়টা অনেক বেশি পাওয়া যায়। এক একটা পর্ব ৪০-৫০ মিনিটের। প্রায় সাত-আট ঘণ্টা সময় পেলে চরিত্র এক্সপ্লোর করতে পারবেনই। ওটিটি-র দৌলতেই গোলুকে পেয়েছি আমি, ডা. শ্রেয়াকে (লাখো মে এক) পেয়েছি। কিন্তু সব মাধ্যমেরই আলাদা মজা আছে।

কাজের বাইরে কী করতে ভাল লাগে?
আমার কাছে জীবন বাঁচার জন্য। জ়িন্দগি জিনে কে লিয়ে হ্যায়। বেড়াতে ভালবাসি। আর বই পড়তে। এখন আমার বাড়িভর্তি বই পাবেন।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম



আন্তর্জাতিক ধনুষ

আন্তর্জাতিক প্রজেক্টে কাজ করে বেশ প্রশংসা কুড়োচ্ছেন অভিনেতা ধনুষ। রায়ান গসলিং ও ক্রিস ইভানসের পাশে নজর কেড়েছে ধনুষের অ্যাকশন-প্যাকড চরিত্র। রুসো ব্রাদার্সের পরিচালনায় 'দ্য গ্রে ম্যান' মুক্তি পেয়েছে সদ্য নেটফ্লিক্সে। সেই উপলক্ষে ভারতে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ধনুষ ও রুসো ব্রাদার্স। ধনুষ জানান, তিনি পরিচালকদ্বয়ের কাজের ফ্যান আগে থেকেই। তাঁদের প্রিয় কাজ 'ইনফিনিটি ওয়ার'। "আসলে বাড়িতে বাচ্চা থাকলে রুসো ব্রাদার্সের ছবি দেখতেই হবে আপনাকে", হেসে জানালেন অভিনেতা। উত্তর-দক্ষিণ ভারতের বিভেদ নিয়েও কথা বলেন এদিন। ছবিতে তাঁর সহ-অভিনেতা তাঁকে সেক্সি তামিলিয়ান ফ্রেন্ড বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু ছবিতে এহেন উক্তি নিয়ে অসুবিধে নেই ধনুষের। তবে ছবির বাইরে, উত্তর-দক্ষিণ হিসেবে আলাদা করে না দেখে সকলকে ভারতীয় অভিনেতা বলেই সম্বোধন করা উচিত বলে মত ধনুষের। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সুবাদে কাজের সুযোগও বাড়ছে সকলের জন্যই, জানান তিনি।



নতুন চরিত্রে অর্কজা

ছোটপরদায় ফের দেখা যেতে চলেছে অর্কজা আচার্যকে। নতুন ধারাবাহিক 'শ্রেয়সী'র মুখ্য চরিত্রে তিনি। সুবোধ ঘোষের উপন্যাস অবলম্বনে ধারাবাহিকের নির্মাণ করেছেন অনিন্দ্য সরকার। গল্পে অর্কজা এক অনাথ মেয়ে। ঘটনাচক্রে জোর করে তার বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে সে জানতে পারে স্বামীর অন্য প্রেমিকা আছে, যে আবার অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। সবমিলিয়ে সম্পর্কে জোরালো টানাপড়েন শুরু হয়। শ্রেয়সী নিজের অধিকার রক্ষায় ঠিক কী করবে, সেটাই এই ধারাবাহিকের উপজীব্য। অর্কজার কথায়, "এই ধারাবাহিকে আমি অথর-ব্যাকড চরিত্র পেয়েছি। তাই পারফর্ম করার প্রচুর সুযোগ আছে। এর আগে করা আমার সব চরিত্রগুলোর চেয়ে এটি আলাদা। প্রচুর শেডস আছে শ্রেয়সীর চরিত্রে। একজন দৃঢ় মানসিকতার মহিলা সে। আমার ধারণা, দর্শকরাও সহজেই কানেক্ট করতে পারবেন আমার চরিত্র ও এই গল্পের সঙ্গে।" নতুন চরিত্রে কতটা প্রশংসা কুড়োন অভিনেত্রী, এখন তারই অপেক্ষা। অন্যান্য চরিত্রে সায়ন কর্মকার, সৌমী ঘোষ-সহ ছোটপরদার একাধিক পরিচিত মুখ রয়েছেন।



ছবিতে উত্তম কুমারের লেখা গান

উত্তম কুমারের বায়োপিক 'অচেনা উত্তম' মুক্তি পেয়েছে সদ্য। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার উপালি চট্টোপাধ্যায়ের উপরে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও গান, দুয়েরই নেপথ্যে তিনি। ছবিটি বাঙালি সেন্টিমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে, তাই গান নিয়েও একটু আলাদা ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছে উপালিকে। সাহেব চট্টোপাধ্যায়, দুর্নিবার সাহা, স্নিগ্ধজিৎ-সহ একাধিক শিল্পী বিভিন্ন গান গেয়েছেন। তিনি জানালেন, "ছবিতে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছি। এছাড়াও 'হিন্দুস্তান মে কেয়া হ্যায়' বলে একটি গান ব্যবহার করা হয়েছে ছবিতে। এটি উত্তম কুমারের নিজের লেখা। ওঁর বিশেষ প্রিয় একটি লেখা। তবে এর কোনও রেকর্ডেড ভার্শন ছিল না। তাই গানটিকে সুর দিয়ে পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে আমাকেই। পুরোটাই লাইভ রেকর্ড করা হয়েছে। আর এই ছবির জন্য 'ছদ্মবেশী গন্ধর্ব' বলে একটি গান লিখেছি ও গেয়েছি। উত্তম কুমারের বিভিন্ন সিনেমার নাম এই গানের কথার অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছি। আসলে অনেকটা সময় ধরে ছবি তৈরি হয়েছে। প্যানডেমিকের ফলে খানিকটা দেরি হয়েছিল। তাই, অনেকটা সময় পেয়েছি। একটা পিরিয়ড পিসকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় হোমওয়র্ক করতে পেরেছি। একটা বড় মিউজ়িক টিম, ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন বর্ষীয়ান যন্ত্রশিল্পী কাজ করেছেন। ১৬জন সঙ্গীতশিল্পী, ব্যাকগ্রাউন্ডে কয়্যার ভোকালস, লাইভ মিউজ়িশিয়ান রয়েছেন ছবির গানগুলোর নেপথ্যে।"

